দাম : ষোলো টাকা

মোদীর সিদ্ধান্তে সিলমোহর নোটবন্দি বৈধ
— পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

কলেজিয়াম ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী
— পৃঃ ১৭

৭৫ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ১৬ জানুয়ারি, ২০২৩।। ১ মাঘ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

নোটবন্দি

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ১ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১৬ জানুয়ারি - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'পাপের ঘড়া পূর্ণ' 'দুঃসহ দুর্নীতি' রাজ্যের সামগ্রিক চিত্র আর 'মানুষের বিরোধী স্বর' □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

মোদী ফেল, থ্যাংক ইউ দিদি □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

বিচারকদের পরচুলা ব্রিটিশ শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয় □ প্রিয়ংবদা শিবাজী □ ৮

দেশদ্রোহিতা বামপন্থীদের রক্তে □ বিশ্বামিত্র □ ১০

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মোদী সরকারের মনোবল বৃদ্ধি পাবে □ আনন্দ মোহন দাস □ ১১

মান্যতা দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত, মোদীর সিদ্ধান্তে সিলমোহর, নোটবন্দি বৈধ □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ১৩

পাকিস্তানও কি এবার তালিবানের হাতে! □ দিগন্ত চক্রবর্তী □ ১৫

পুলিশের অসভ্যতায় কলঙ্কিত পশ্চিমবঙ্গ □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৬

কলেজিয়াম ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী □ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ১৭

নোটবন্দিতে শেষ সমান্তরাল অর্থনীতি □ নিখিল চিত্রকর □ ২৩

সারা দেশে নানা নামে পালিত হয় মকর সংক্রান্তি উৎসব □ প্রবীর কুমার মিত্র □ ৩১

সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন কবীর □ দীপক খাঁ □ ৩৩

বহুত্বের পুণ্যভূমিতে জেহাদের অশনি সংকেত □ অনির্বাণ দে □ ৩৫

পরিযায়ী ভোটদাতাদের জন্য আরভিএম প্রযুক্তি আনছে নির্বাচন কমিশন □ অনুপ চান্দোক □ ৩৭

ন্যানোবটে চড়ে অমরত্বের সন্ধানে □ ড. ধনঞ্জয় দাস □ ৪৩

মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশ গণহত্যা বিলের ভবিষ্যৎ কী? □ শিতাংশু গুহ □ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ □ রঙ্গম : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ২৩ জানুয়ারি ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৩ জানুয়ারি ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

সুভাষ থেকে নেতাজী

ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে নেতাজী যদি যুদ্ধ ঘোষণা না করতেন তাহলে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্ভবত আরও বিলম্বিত হতো। অথচ এই অনমনীয় যোদ্ধার মূল্যায়ন আমরা আজও করে উঠতে পারিনি। বিশেষ করে নেতাজীর বিবাহ এবং মৃত্যু নিয়ে মিথ্যাচার এখনও অব্যাহত। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে নেতাজীর জীবনের কয়েকটি দিক নিয়ে মূল্যায়ন। এছাড়া, ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী সংস্থাগুলি সম্বন্ধে থাকবে বিশেষ আলোচনা।

লিখবেন— ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, রাজদীপ মিশ্র, নিখিল চিত্রকর, বিমলশঙ্কর নন্দ, সুজিত রায়, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মানন্দ দেব প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আদালতে সত্যের জয়

দেশে সুশাসন ও দুর্নীতির মূলোৎপাটন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী রূপে দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্বের মাত্র দুই বৎসর অতিবাহিত হইবার পর তিনি দেশের কালোটাকা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে নোটবন্দি নামক অর্থনৈতিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মতো একটি অতি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্নীতির কারবারিদের বেশ কয়েকবার তিনি ইঙ্গিতে সতর্ক করিবার পর ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি নোটবন্দির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঘোষণার অব্যবহিত পরেই দুর্নীতির জনক কংগ্রেস দল ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের তীব্র আর্তনাদ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কংগ্রেস ও তাহার দোসর দলগুলি দেশবাসীর সর্বনাশ হইবে বলিয়া চিলচিৎকার করিয়া, কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করিয়া দেশের সাধারণ মানুষকে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শামিল করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে। সচেতন দেশবাসী সাময়িক কষ্ট স্বীকার করিলেও দুর্নীতিপরায়ণ বিরোধীদের কথায় বিভ্রান্ত হন নাই। স্বাধীনতার পর হইতে দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় থাকিবার সুবাদে কংগ্রেস ও দুর্নীতি সমার্থক হইয়া পড়িয়াছিল। দেশ ও দেশবাসীর উন্নতির কথা ভাবিবার অবকাশ তাহাদের ছিল না। তাহাদের শাসনকালে সর্বক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রতিচ্ছবি ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের প্রধানমন্ত্রী ভিক্ষাপাত্র লইয়া বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন। সেই সময় দেশের মানুষ প্রকৃত নায়করূপে কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। স্বভাবতই দেশবাসী একজন প্রকৃত নায়কের সন্ধান করিতেছিল। স্বাধীনতার বহু বৎসর পর দেশবাসীর সেই আশা পূরণ হইয়াছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে তাহারা প্রকৃত দেশনায়ক এবং দক্ষ প্রশাসকের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীও বিলম্ব না করিয়া দুর্নীতির নিরসন কল্পে নোটবন্দির মতো সাহসী পদক্ষেপ লইয়াছিলেন। বিরোধীরা যখন ইহার প্রতিবাদে মুখর হইয়াছেন , ঠিক তখনই বিশ্ব ব্যাংক নোটবন্দির সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি জানাইয়াছে। ইহার পরেও বিরোধীদের প্ররোচনায় সারা দেশে নোটবন্দির বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে ৫৮টি অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে। দীর্ঘ পর্যালোচনা করিয়া সর্বোচ্চ আদালত গত ২ জানুয়ারি নরেন্দ্র মোদী সরকারের নোটবন্দির সিদ্ধান্তকে বৈধ বলিয়া রায় প্রদান করিয়াছে।

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে প্রমাণিত হইল যে মোদী সরকারের উদ্দেশ্য ও নীতি দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের স্বার্থেই পরিচালিত হইতেছে। দীর্ঘ কংগ্রেসি শাসনে গগনচুম্বী দুর্নীতির কারণে দেশে হিসাব বহির্ভূত সমান্তরাল অর্থনীতি চালু হইয়াছিল। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি জালনোট ছড়াইয়া দেশের অর্থব্যবস্থার উপর প্রশ্নচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল। বিশেষজ্ঞদের মত হইল, সঠিক সময়ে নোটবন্দির মতো সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া ইহাদের মূলে কুঠারাগাত করা সম্ভব হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্যেই জানা গিয়াছে, নোট বাতিলের সময় জমা হওয়া ২.৮৯ লক্ষ কোটি টাকার তদন্ত চলিতেছে। বহু লক্ষ সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করা গিয়াছে। লেন-দেন সংক্রান্ত লক্ষ লক্ষ নূতন মামলা দায়ের হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, নোটবন্দির কারণে ৫৬ লক্ষ নূতন করদাতা যুক্ত হইয়াছেন। ব্যবসায়ীরা নিয়মিত কর প্রদান করিতে শুরু করিয়াছেন। ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যক্তিগত আয়কর আদায়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে বহুগুণ। ডিজিটাল লেন-দেনে মানুষ সড়গড় হইয়াছে। মাওবাদী-সহ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির উপর ঘাতক প্রভাব পড়িয়াছে।

বিরোধীরা শুধুমাত্র মোদী বিরোধিতার জন্য নোটবন্দির ইতিবাচক দিকগুলি অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না। তাহাদের তো সর্বাগ্রে পরিবার। তাহার পরে দল ও ভোট। তাই একজন বিচারপতির নোটবন্দির পদ্ধতি লইয়া একটু ভিন্ন মত পোষণ করাকে তাহাদের নৈতিক জয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। নোটবন্দির সময় কংগ্রেসের চাইতেও উচ্চগ্রামে সরব হইয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আবার নোটবন্দির দিনটিকে কালাদিবস হিসাবেও পালন করিয়াছিলেন। দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করিতেছেন তৃণমূল দলটি আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের নেতা-মন্ত্রীরা বাড়িতে টাকার পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার জন্যই নোটবন্দির ঘোষণায় মমতা ব্যানার্জি এত উচৈঃস্বরে মড়াকান্না জুড়িয়াছিলেন। আজ তাঁহার নেতা-মন্ত্রীদের কপালে জুটিয়াছে কারাবাস। প্রমাণিত হইয়াছে, দুর্নীতিতে মমতা ব্যানার্জি সুপারম্যান এবং তাহার দল সুপার পাওয়ার। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যতই তাহারা কালাদিবস পালন করিবেন, দেশের মানুয় ততই তাহাদিগকে কালো তালিকাভুক্ত করিবেন।

সুভাষিতম্

ভাষাসু মুখ্যা মধুরা দিব্যা গীর্বাণভারতী।
তস্যাং হি কাব্যং মধুরং তস্মাদপি সুভাষিতম্।।

ভাষাসমুহের মধ্যে মধুর ভাষা হলো সংস্কৃত। সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বাধিক মধুর হলো কাব্য। আর কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক মধুর হলো সুভাষিতম্।

‘পাপের ঘড়া পূর্ণ’

‘দুঃসহ দুর্নীতি’ রাজ্যের সামগ্রিক চিত্র আর ‘মানুষের বিরোধী স্বর’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পাঠক আমার ঈশ্বর। তাঁদের মতামত শিরোধার্য। নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে এই রাজ্যের সামগ্রিক চিত্র কেবল দুর্নীতির। অন্য কিছু নয়। তা বন্দেভারত ট্রেনে পাথর ছোড়ার মতো নিকৃষ্ট ঘটনাই হোক বা মন্ত্রীর বাড়িতে বেআইনি টাকা পাওয়া বা শিক্ষায় বেআইনি নিয়োগ। ফলে নাগরিক বিল বা আবাস যোজনার বিষয়ে অনেক কিছু বলার থাকলেও আপাতত তা শিকেয় তুলে রাখছি। কারণ এ রাজ্যে দুর্নীতি সবেতেই ছেয়ে রয়েছে। তা না সরলে অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা অর্থহীন। এসবের কেন্দ্রবিন্দুতে আর অভিযোগের পরিসরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর কিছু দলীয় নেতা আর পারিবারিক সদস্য। তাঁকে বাদ দিয়ে রাজ্য রাজনীতির সমস্ত আলোচনাই বেমানান আর সামঞ্জস্যহীন। তা সে যত একঘেয়ে হোক। তিনি এখন ‘দুষ্ট-বিঘ্নের’ পথ হয়ে উঠেছেন। রাজ্যবাসীর কাছে এটা দুর্ভাগ্যের যে একসময়ের ‘সততার প্রতীক’ এখন ‘শঠতার নিদর্শন’ আর জনমানসে নঞর্থক মুখ।

সবাই জানেন তৃণমূল এখন ‘দুর্নীতির ডুবোজাহাজ’। মমতা তার ক্যাপ্টেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড পামার (ইপি) থমসন লড়াইয়ের নতুন ভাষা দিয়েছিলেন ‘প্রোটেক্ট অ্যান্ড সারভাইভ নট প্রোটেস্ট অ্যান্ড সারভাইভ’। শুধু প্রতিবাদ নয়, সুরক্ষা করে বাঁচতে হবে। অর্থাৎ বিরোধী ভোট সুরক্ষিত করতে হবে। তাতে যদি ভোট বয়কট করতে হয় তাই করতে হবে। কথাটা একটু বেমানান লাগতে পারে। তাই রাজ্যজুড়ে যা চলছে তাতে এটাই হয়তো চরম পরিণতি। এটা কোনো বামমার্কা আবেগ নয়। রাজনৈতিক টক্কর। প্রয়োজনে এ রাজ্যে বিরোধীদের সে কৌশল ব্যবহার করতে হতে পারে। সংসদীয় রাজনীতিতে তার অনেক উদাহরণ রয়েছে।

ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে দুর্নীতির এমন দুঃসহ চিত্র আছে বলে জানা নেই। তবে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীরা যদি অন্তত ২৫ শতাংশ (আনুমানিক ৭৪ হাজার গ্রামপঞ্চায়েত আসনের মধ্যে ১৭ থেকে ২০ হাজার) আসন জিততে না পারেন তাহলে আমার ধারণা দুর্নীতি বিরোধী অতি উৎসাহীদের মত হয়তো ভুল প্রমাণিত হবে। বাম বিদায়ের শেষধাপে রাজ্যের তিতিবিরক্ত মানুষ যেমন বলতেন ‘আর সহ্য হচ্ছে না, এবার পালটাতে হবে’। মমতার এখন সেই দশা। বিরোধীদলগুলি সেই পরিস্থিতির কতটা সদ্ব্যবহার করতে পারবে সেটাই দেখার।

পঞ্চায়েত ভোটে গ্রামীণ তৃণমূল নেতাদের জবরদস্তি আর অত্যাচারের কাহিনির কথা সর্বজনবিদিত। ২০১৮-র ভোটে তৃণমূলের গ্রামবাহিনী ৩৫ শতাংশ মানুষকে জোর করে ভোট দিতে দেয়নি বলে অভিযোগ। রাজ্যের ১৫০টির মতো বিধানসভা আসন গ্রামবাঙ্গলায়। সিপিএমের মতো মমতার বুনিয়াদ এই গ্রামাঞ্চল। অত্যাচার, অবিচার আর ভোট না করতে দেওয়ার অছিলা দেখিয়ে বিরোধীরা যদি পিছিয়ে পড়েন, মমতার তুলনায় তারা দুর্বল তা মানতে বাধ্য হব। ‘মমতা ভোট হতে দিলে তো’ বা ‘করতে দিলে তো’ এই ধরনের গাছাড়া কথা বললে বিরোধীরা নিজেদের দুর্বলতাই প্রমাণ করবেন।

তৃণমূল তৈরি হয়েছিল সিপিএমকে দেখে আর কংগ্রেস ভেঙে। অনুকরণ আর রাজনৈতিক ভাঙন তৃণমূলের জোর। কংগ্রেস আর সিপিএমের শেষপ্রহরে তাদের নেতাদের অহংকার আর আত্মম্ভরিতা এ রাজ্যের মানুষ দেখেছেন। বহুবার বলেছি, মমতার তৃণমূল আসলে কংগ্রেস আর সি পি এমের মিশ্রণ। এই রাজনৈতিক মিশ্রণকে আলাদাভাবে চেনা অসম্ভব। রাজ্যের মানুষকে একসঙ্গে শত্রু চিনতে হবে। আর সে গুরুদায়িত্ব বিজেপির।

‘চট-ভূত’ দেখিয়ে সিপিএম বছরে পর বছর ভোট জিতেছে। ভোটবাক্সের চটের ঢাকার আড়ালে সিপিএমের ক্যাডার বাহিনী দেখত কোথায় ভোট পড়ছে। তারপর চালু হতো গ্রাম্য অত্যাচার। সিপিএম শিক্ষায় শিক্ষিত তৃণমূল। সে যে তাই করবে সেটাই স্বাভাবিক। হুমকি, দাবড়ানি আর আক্রমণের বস্তাপচা কায়দা তারা ইতিমধ্যেই শুরু করেছে। অনেকে বলেন, সিপিএম পুলিশের হাঁটু মুড়ে দিয়েছিল। মমতা প্রশাসন তাকে শুইয়ে দিয়েছে।

‘নব কংগ্রেসের মতো নব তৃণমূল’ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রলেপ দিতে চাইলেও হবে না। তিনি বাধ্য হয়ে কিছু বলছেন, যদিও জানেন বাস্তবে তা সম্ভব নয়। ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।’ আগেই বলেছি, অভিযুক্ত মমতাকে বাদ দিয়ে রাজ্যের মানুষের অধোগতি বা দুর্নীতির আলোচনা করা যায় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, আবাস, চাকুরি আর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি অধ্যায় , সুস্থ সবলতার চিত্র এ রাজ্যের মানুষ ভুলে গিয়েছে।

২০১৩ সালের পর থেকে এ রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করতে ভুলে গিয়েছে তারা সুস্থ জীবন ফিরে পেতে পারেন। ২০১৬ আর ২০২১-এর রাজ্য নির্বাচনে সেই স্বাস্থ্যহানি মুখ বুজে মেনে নিয়েছিলেন। ‘পাবলিক মেমরি’ বা জনস্মৃতির আয়ু ছোটো। তাই মমতা এতদিন অন্যের রাজনৈতিক ঘর পুড়িয়েছেন। বোঝেননি যে তার নিজের ঘরে আগুন ধরে গিয়েছে। সে আগুন সহজে নিভবে না। □

মোদী ফেল, থ্যাংক ইউ দিদি

গরিবদরদি দিদি,

কেন্দ্র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বারবার টাকা আটকানোর কথা বলছে। ততবারই দিদি আপনি বলেন, এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি আছে। ঠিকই বলেন। আমি তো আরও একটা কথা বলতে চাই। এতকাল যাঁদের বাড়ি ছিল না, তাঁদের আবার বাড়ি দরকার কীসের? আপনারও তো টালির বাড়ি। ভাইপোর যাই থাকুক না কেন আপনার তো টালির বাড়ি। কই, আপনি তো সেই বাড়িকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকায় পাকা ছাদের করছেন না? তা হলে? এমন বাড়ি যাঁদের আছে তাঁরা তো ওই বাড়িতেই অভ্যস্ত। তবে আবার পাকাবাড়ি দরকার কীসের? বরং, যাঁদের পাকা বাড়িতে থাকার অভ্যাস তাঁদের আরও একটা হলে তো ভালোই হয়। ঠিক কি না? আমি শুনতে পাচ্ছি দিদি, আপনি বলছেন, 'ঠিক ঠিক।'

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সংশোধিত তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে, ১৪ লক্ষ অযোগ্য ব্যক্তির নাম সেই তালিকায় রয়েছে। সংখ্যাটা ভাবা যায়! সেটার আবার খোঁজ পেয়েছে রাজ্য সরকার। মানে আপনার সরকারই। কেন যে আপনি খোঁজার নির্দেশ দিলেন কে জানে? ও, কেন্দ্রের চাপে! তা হলে আপনি আর কী করবেন!

মোট আবাস যোজনা প্রাপকের এক-চতুর্থাংশই জালি। তবে তো দিদি, কেন্দ্রের সন্দেহকে অমূলক বলা যাবে না! ভাবছি, কেন্দ্র ভাগ্যিস এখন বলছে। আগে বললে সর্বনাশ হয়ে যেত। কারণ, এখন যে জালিতে ভরা তালিকা পাওয়া গিয়েছে সেটা সম্ভাব্যদের। মানে এঁরা এখনও টাকা পাননি। কিন্তু দিদি, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা শুরু হওয়ার পরে এখনও পর্যন্ত যতজন অনুদান পেয়েছেন, তাঁদের যোগ্যতা যদি এভাবে যাচাই করা হয়? তাহলে কী হবে দিদি। মনে হয় না আর হবে। আসলে এই রাজ্যে বিজেপির শক্তি বেড়ে যাওয়াতেই মুশকিল হয়েছে। আগে সিপিএম আর কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলা যেত। কিন্তু এখন সেটা আর হচ্ছে না। দুই দলই শূন্য। ফলে এখন সব কিছুতেই চোর ধরা পড়ছে। আমি ভাবছি, স্কুলে চাকরির মতো এখানেও আবাস বিক্রির অভিযোগ উঠবে না তো?

এটা কিন্তু সবাই জানে যে, প্রথম থেকেই গরিব পরিবারের জন্য পাকাবাড়ি তৈরির সরকারি টাকায় রাজ্যের গ্রামে গ্রামে তৈরি হয়েছে প্রাসাদোপম বাড়ি, দোকান, ক্লাব। প্রাপকের পারিবারিক আয়, জমিহীনতা, জবকার্ডে কাজের পরিমাণ মানে তালিকায় নাম থাকতে যে সব শর্ত মানতে হয়, সে সবকে গুলি মেরে একটাই যোগ্যতা, তাহলো শাসক দলের সঙ্গে প্রাপকের ঘনিষ্ঠতা। মানে তৃণমূলটা করতেই হবে। এটা কিন্তু দিদি ঠিক সিদ্ধান্তই ছিল। খালি, যদি গরিব তৃণমূল কর্মীরা পেতেন তাতেও কোনও অসুবিধা হতো না। কিন্তু 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি' নীতি নিতে গিয়েই যত বিপদ হলো।

তৃণমূল সরকার এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের শর্ত রক্ষা করতে পারছে না কেন? এর পিছনে কি নৈতিক সংকট বড়ো কারণ হয়ে উঠেছে? এসব প্রশ্ন উঠছে। মানে আদালত থেকে রাজনীতিকরা তুলছেন। দিদি, একটা বিষয় কিন্তু ভালো হয়েছে যে আপনি কায়দা করে সবকটা বুদ্ধিজীবীকে বঙ্গ পুরস্কার দিয়ে কিনে নিয়েছেন। একটা ব্যাটাও মুখে রা কাটছে না। আপনার বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে।

আরও একটা বিষয় আপনি অত্যন্ত বুদ্ধি করে করেছিলেন। প্রকল্পটার নামই বদলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি এতটাই খারাপ দল যে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে ভুল খুঁজে বের করেছে। আপনাকে সেই নাম বদলাতে হলো। প্রথমে প্রকল্পের 'বাংলা আবাস যোজনা' নাম বাতিল করে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' ফিরিয়ে আনা এবং পরে প্রাপক তালিকায় প্রতি চার জনের এক জনকে 'ভুয়ো' বলে স্বীকার করা, এ দুটোই রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও প্রশাসনিক অপদার্থতার স্বাক্ষর হয়ে থাকবে। এটা ঠিক। কিন্তু দিদি আপনার কোনও ভুল ছিল না। কারণ, এই সব ছোটোখাট বিষয় কি আপনি দেখবেন না কি!

তবে দিদি, আমি একটা অন্য কারণে কষ্টে আছি। আপনার ভাই বলেই এই কষ্ট। আসলে আপনার থেকেই তো আমি গরিবদের কথা ভাবতে শিখেছি। কিন্তু এখন দেখছি, আপনার বুদ্ধির জন্য কত সত্যিকারের গৃহহীন মানুষ আবাস প্রকল্পের টাকা প্রাপকের তালিকায় স্থান পাননি। এর ফলে কিন্তু একটা বড়ো কাজ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, সব গরিব মানুষের মাথার উপরে পাকা ছাদ থাকবে। তাঁর সরকার শপথ নিয়েছিল। সেই শপথকে মিথ্যা করে দেওয়া গিয়েছে। এটা খুব ভালো। মোদী ফেল বলতে সুবিধা হবে।

তালিকায় যাঁদের নাম নেই তাঁদের টাকা পাওয়াও উচিত নয়। মোদীজী যতই চান বাংলার নিয়মেই বাংলা চলবে। যাঁরা তৃণমূল নেতাদের উৎকোচ দিতে অক্ষম কিংবা বিজেপি করে, তাঁদের কোনও অধিকারই এই রাজ্যে থাকবে না। দিদি আপনার নামে শপথ নিয়ে বলছি, আপনার ভাই হিসেবে সেটা হোক আমি চাই না। কিন্তু আবার এটাও ভাবছি, লোকগুলো তো খুবই গরিব। এখনও বাড়ি নেই। কী শীতটাই না পড়েছে এবার। ইস্! যদি পাকাবাড়ি থাকত তবে এরা একটু আরামে থাকতে পারতেন। □

অতিথি কলম

প্রিয়ংবদা শিবাজী

বিচারকদের পরচুলা ব্রিটিশ শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়

ন্যায় বিভাগকে ঔপনিবেশিক খোঁয়াড় ভেঙে বের করতে গেলে বিচারপ্রার্থীদের পক্ষে পদ্ধতির সংস্কার জরুরি, যাতে এমনটা মনে হয় বিচারব্যবস্থা বিচারপ্রার্থীর সঙ্গে ও পক্ষে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

ইংরেজের দেশের আদালতে চালু থাকা বিচিত্র আলংকারিক পোশাক-আশাক যা তারা অধীনস্থ প্রজাদের কিছুটা আতঙ্কিত করে রাখতে এদেশে প্রবর্তন করেছিলেন তার মধ্যে তাঁরা যে আমাদের চেয়ে আলাদা উন্নত শাসকশ্রেণী এটা প্রমাণ করারও তাগিদ ছিল। অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে যাওয়া সাধারণ মানুষের মনে চারপাশের পরিবেশ দেখে ভয় পাইয়ে দেওয়াও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

২০১০ সালে কলকাতা উচ্চ আদালতের পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার দাবি করেছিলেন, ২০০৫ সালে লাগু হওয়া রাইট টু ইনফরমেশান অ্যাক্টের পরিধি কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল এই আদালত ভারতের কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। এর প্রতিষ্ঠা Her majesty queen of England রানি ভিক্টোরিয়ার বিশেষ সনদ বলে হয়েছিল। অর্থাৎ উচ্চ আদালতকে যুক্তিগতভাবে কখনই আরটিআই আইনের আওতায় পাবলিক অথরিটি বলা যায় না। যদিও এই যুক্তি ন্যায়সঙ্গতভাবেই তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টি ভারতের প্রাচীনতম আদালতে উত্থাপনের প্রসঙ্গটি হেলাফেলার নয়। এটি পর্যাপ্তভাবে প্রমাণ করে বিচারবিভাগের মধ্যে ঔপনিবেশিক ইংরেজি প্রথা প্রকরণ ও পোশাক-আশাকের প্রতি আসক্তি কতটা গভীরভাবে প্রোথিত।

ন্যায় ঔপনিবেশিক ধারা : সীমিত প্রজাদের ওপর বিলিতি crown justice কীভাবে বিতরিত হবে তা নির্ধারণ করতে আদালতে নানারকম সাংকেতিক বিষয় চালু হয়েছিল। যাতে এই বিদেশি আধিপত্য ও তার দাপট অধীনস্থ নেটিভ প্রজারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তাদের ওপর চারদিকের পরিবেশ যাতে একটা অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করে। যেমন বিচারের আশায় যারা বিচারকক্ষগুলিতে ঢুকবে তারা যেন সেই জায়গার পরিবেশ দেখে হতচকিত হয়ে পড়ে। সেখানে এমন সব চিহ্ন ও বিচিত্র ধরনের সাংকেতিক স্টাইল থাকবে যা প্রজাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাস্তবে ন্যায়াধীশরা ছিলেন ইংরেজ শাসকের ডানহাত। তাঁদের সম্পর্কে বিস্ময় ও চাপা আতঙ্ক বিচারপ্রার্থীদের মনে ছড়িয়ে দিতে এই ধরনের বিচিত্র এবং দেশের মানুষের অজানা নানা ব্যবস্থা চালু ছিল। একেবারে নাম করে বললে বিচারকের বিপুল আজানুলম্বিত জোব্বা বা মাথার বৃহৎ সাইজের wig বা পরচুলা।

লক্ষ্য করে দেখুন, আজকের দিনের আদালতেও এই ধরনের সাংকেতিক সব অলংকরণ বা সামগ্রিকভাবে কক্ষের আসবাবপত্র এমনভাবে রাখা হয় যাতে আদালতের ক্ষমতা, মাহাত্ম্য, অবস্থান ও বিপুল অধিকারের প্রদর্শনই চোখে পড়বে। কিন্তু আজকের দিনে যেখানে বিচারপ্রার্থীর অধিকারকে আইন ও সংবিধানের চোখে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং যা তার অধিকার বলে মান্য হয় সেখানে এই ধরনের পারিপার্শ্বিক নিতান্তই বিসদৃশ। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরেও ন্যায়বিভাগ আজও সেই ঔপনিবেশিক হীনমন্যতাজনিত নানাবিধ তাঁবেদারিসুলভ রীতিনীতিকে বর্জন করতে পারেনি। তার ফলে সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থার ধাঁচাটিই কিছুতেই ন্যায়প্রার্থীদের কাছে বান্ধবসুলভ হয়ে উঠতে পারছে না। অথচ এদের যথাযথ সেবা দেওয়াই ন্যায়বিভাগের প্রাথমিক দায়িত্ব। চিরাচরিত ধারার সঙ্গে প্রধানত তিনটি বিষয় বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। বিচার কক্ষের চেহারা, পোশাক, বৈশিষ্ট্য ও বাধ্যতামূলকতা এবং বিশেষ করে আদালতের লেখালেখি, রায়দান ইত্যাদিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তা অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। অধিকাংশই সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। বিচারপ্রার্থী বিচারালয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত— বিচারকক্ষের নির্মাণশৈলী এবং তার আসবাবপত্রগুলির অবস্থান এমনভাবে থাকে যাতে ন্যায়প্রার্থীর স্থান অতি অবহেলায় নির্ধারিত হয়। এগুলি করা হয় মূলত :

(১) কারুকার্যময় ভাবে কিছুটা উচ্চাসনেই ন্যায়াধীশ সর্বদা অধিষ্ঠিত থাকেন।

(২) সাক্ষীর নির্দিষ্ট স্থান যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন জায়গায় চিহ্নিত।

(৩) খোলা বিচারালয়গুলিতে বিচার কার্যক্রম দেখা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত।

(৪) বিচারপ্রার্থীর জন্য বিতরিত আদালত কক্ষে স্থান অত্যন্ত কম। অধিকাংশ স্থান অধিকার করে থাকে অভিযুক্তের কাঠগড়া, প্রচুর চেয়ার টেবিল যার অধিকাংশই উকিল ও অন্যান্য বাবুদের।

ন্যায়-বিচার কক্ষগুলির এই ধরনের প্রদর্শনের মাধ্যমে নাগরিকদের সামাজিক অবস্থানের একটি সরাসরি ইঙ্গিতও সঞ্চারিত করা হয় যে তাদের বাস্তব অবস্থান আসলে কেমন। তাদের পরোক্ষে ভয় দেখানো হয় যে ন্যায়-বিচার পদ্ধতির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হলেও বিচার ব্যবস্থা তাদের বিশেষ সমাদর করতে ইচ্ছুক নয়। আবার বলছি, কক্ষগুলির সামগ্রিক ডিজাইনগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই আধিপত্যবাদের আগাম জানান দিতে চায়। অথচ ন্যায় বিভাগের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হলো সকলকে সঙ্গে নিয়ে, তাদের অংশগ্রহণ করিয়ে ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা উদ্‌যাপন করা।

এই বিচারকক্ষের সূত্রে প্রথমেই অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তারা শুরুতেই মাথায় রেখেছে কক্ষগুলি যেন বিচারপ্রার্থীর পক্ষে ভীতিপ্রদ না হয়। এ জন্য স্থানীয় যে সমস্ত অঙ্কন ও চিরাচরিত ইতিহাস ভাবনাগুলি জনমনে প্রোথিত, সেগুলিই তারা আঞ্চলিক প্রাচীন অধিবাসীদের সহায়তায় বিচারকক্ষগুলিতে অঙ্কনের মাধ্যমে তুলে এনেছে। ক্ষমতাসীন দল বলতে চাইছে, স্থানীয় অস্ট্রেলিয়াবাসী যেন বুঝতে পারে এই আদালত সর্বদা তাদেরই পক্ষে। বিচার পরে বিচার্য। প্রাথমিকভাবে যেন বিরূপ বা আতঙ্কের প্রভাব তাদের মনের ওপর না পড়ে। আদালত যে তাদের নিজেদেরই তারা যেন এমন একটা অনুভব পায়।

একই ভাবে নিউজিল্যান্ডের সুপ্রিম কোর্ট তাদের কক্ষ নির্মাণের সময় স্থানীয় গাছগাছড়ার প্রতিরূপ স্থাপন করেছে, তারা দেখতে বজ্রকঠিন বা একেবারেই ভীতিপ্রদ নয় মানুষের কাছে তা কিছুটা ক্ষুদ্র কিন্তু একেবারে তাদের ভাবনার সঙ্গে জড়িত থাকে বলে স্পেশাল বা বিশেষ।

উদ্ভট বাধ্যতামূলক পোশাক : উকিলবাবু ও বিচারকেরা বাধ্যতামূলকভাবে কালো কোর্ট ও জোব্বা ধারণ করতে অভ্যস্ত। এর মূলে রয়েছে ব্রিটেনের ঐতিহাসিক ট্রাডিশন যা অকাট্য। অথচ এই ধরাচুড়ো আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়ার সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না। অন্যদিকে, আমাদের দেশের প্রাচীন আইনি প্রকার-প্রকরণের সঙ্গেও তার কোনো তালমিল নেই। এর মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়েছিল কোভিড মহামারীর সময়। সেই সময় অনেক বিচারালয়ে ভিডিয়ো কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে শুনানি হয়েছে। কয়েকটি আদালতে গরমের সময় পোশাকের বাধ্যবাধ্যকতাও সাময়িকভাবে কিছুটা শিথিল হয়েছিল। তবে অধিকাংশ আদালতে নয়।

সম্প্রতি দেশের প্রধান বিচারপতি ভি ওয়াই চন্দ্রচূড় মত প্রকাশ করেছেন যে এই ধরনের বাধ্যতামূলক বিধিগুলিকে পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে। বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের আবহাওয়া এই ধরনের পোশাকের আদৌ অনুকূল নয়। একটি ৫ সদস্যের bar council of India কমিটি সম্প্রতি এই পোশাক বিধি নিয়ে পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে আদালত অভ্যন্তরে স্থানীয় ঐতিহ্য ও পরিচিত প্রথাগুলির অলংকরণ সংযোজিত করার বিষয়টিও দেখছেন। অবশ্য মাথায় পরচুলার ব্যবহার অনেকাংশে বর্তমানে কমলেও কিছু কিছু বিচারালয়ে তা এখনও দেখা যায়। কলকাতা উচ্চ আদালতে কড়া নির্দেশে প্রধান বিচারপতিদের সম্পূর্ণ ইংরেজ প্রবর্তিত পোশাকে বিপুল পরচুলা-সহ রাজ্যপালকে শপথ নেওয়ানোর সময় বাধ্যতামূলকভাবে হাজির হতে হয়। মাদ্রাজ উচ্চ আদালতে বিচারকের ন্যায়দণ্ডটি বিপুল আড়ম্বরে একাধিক ব্যক্তিবাহিত হয়ে তাঁর টেবিলে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই ধরনের আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের বিচারপ্রার্থী শ্রেণীর থেকে বিশেষভাবে আলাদা করে বিপুল ব্যবধান সৃষ্টির প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

লর্ডশিপ ও লেডিশিপ : উকিলবাবুরা লেখেন তাদের বক্তব্য পেশ করার সময় 'humbly praying for' ন্যায় বিচার যেন 'their lordship' বা 'ladyship' প্রদান করেন। এই অত্যন্ত সমর্পিত ও অনুগত প্রার্থনা এটাই প্রমাণ করে বিচারকরা অত্যন্ত ক্ষমতাবান এবং তা প্রতিষ্ঠা করাই তাদের প্রধান কাজ যতটা না নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার দ্বারা মানুষকে পরিত্রাণ করা।

এই যে বিচারব্যবস্থা বিচারপ্রার্থীদের প্রতি সমব্যথী হবে তাদের ব্যবহারজীবীদের ভাষা এমন হবে যাতে বিচারকদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হয়। একই সঙ্গে এমন ভাষা যেন ব্যবহৃত না হয় যাতে মনে হবে বিচারকরা বিচারব্যবস্থার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন এক দীর্ঘ দূরত্বের স্থানে অবস্থান করছেন। সকল বিচারককেই জজ, জাস্টিস বা Mr., ড. ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করা শুরু হলে এই ব্যবধান ঘোচানোর পথে অনেক দূর যাওয়া যাবে। অর্থাৎ ন্যায় বিভাগকে ঔপনিবেশিক খোঁয়াড় ভেঙে বের করতে গেলে বিচারপ্রার্থীদের পক্ষে পদ্ধতির সংস্কার জরুরি, যাতে এমনটা মনে হয় বিচারব্যবস্থা বিচারপ্রার্থীর সঙ্গে ও পক্ষে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

(লেখক বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

দেশদ্রোহিতা বামপন্থীদের রক্তে

সিপিএম দলের মহিলা শাখা সংগঠন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সংগঠন বা অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক উইমেন অ্যাসোসিয়েশন (এ আই ডি ডব্লিউ এ)-এর কেরলের রাজধানী তিরুবন্তপুরমে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আয়োজিত ত্রয়োদশতম জাতীয় সম্মেলনের পোস্টারে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

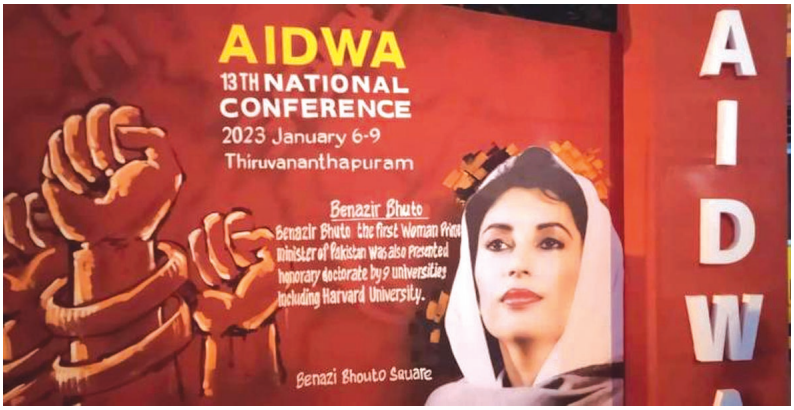

বেনজির ভুট্টোর মুখ! এনিয়ে আপাতত বিতর্ক শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। একে কি দেশদ্রোহিতা বলে? বামপন্থী মহিলা সংগঠনটির যুক্তি, এসব নেহাতই বিজেপির অপপ্রচার। বিজেপির সঙ্গে মতে না মিললেই নাকি দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে দেওয়া হয়। সত্যিই কি তাই?

বামপন্থীদের যুক্তি, তারা আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাদের মহিলা সংগঠনের পোস্টারে জ্বলজ্বল করছে ভুট্টোর উজ্জ্বল পরিচিতি : 'বেনজির ভুট্টো পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এই দেশের প্রথম ও একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী। হার্ভার্ড-সহ মোট ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সাম্মানিক ডক্টরেট পেয়েছেন।' এরকমই দেশ-বিদেশের অনেক কৃতী মহিলার ছবি-সংবলিত আরও পোস্টারও চোখে পড়েছে, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সর্বভারতীয় সম্মেলনে। সুতরাং তারা আন্তর্জাতিকতাবাদী, এই যুক্তিতে বেনজির ভুট্টোর পোস্টারে হয়তো দোষাবহ কিছুর সন্ধান আপাতদৃষ্টিতে নাই পেতে পারেন অনেকে। বেনজিরের পক্ষে আরও একটা যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, বামপন্থী মহিলা সংগঠনের তরফে তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার ও সংগ্রামময় জীবন। বামপন্থী দৃষ্টিতে এই সংগ্রামের আলাদা মহিমা আছে! সবই ঠিক আছে। কিন্তু কে এই বেনজির ভুট্টো? তিনি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর মেয়ে ও প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির স্ত্রী। ভারত-বিরোধিতাটা তিনি পিতৃ-উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেন। তিনি স্বল্পমেয়াদে দুবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন ও ভারতের প্রচুর ক্ষতিসাধন করেন। এমনকী ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার হুমকিও দেন। সুতরাং গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পোস্টারে উল্লেখিত শুধুমাত্র বেনজির ভুট্টো কত ভালো ছাত্রী ছিলেন কিংবা দেশেবিদেশে তিনি এই সুবাদে কী খ্যাতি অর্জন করেছেন, এই বিচারে বেনজিরের মূল্যায়ন করা চলে না। ভারতের কাছে তিনি ভারত-বিদ্বেষী এই পরিচয়টাই সবচেয়ে আগে গুরুত্ব পাবে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি 'সংগ্রামময়' বলে চালানোর চেষ্টা করলেও আসলে তার রাজনৈতিক জীবন বিতর্কিত। একাধিকবার তাকে সেদেশ থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। মূলত সেনাবাহিনীর পরোক্ষ মদত নিয়ে তিনি সেদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চেয়েছেন। তার বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতিরও ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে। সুতরাং সিপিএমের মহিলা সংগঠন যাকে 'সংগ্রামময় রাজনৈতিক জীবন' বলে চালানোর চেষ্টা করছে, তা আসলে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জেহাদকে কাজে লাগানো ব্যতীত আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন হলো, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি কি অতসব না জেনে করলো? এযুক্তিও ধোপে টেকা মুশকিল। আর কিছু না হোক, বেনজির ভুট্টো পাক-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কীভাবে ভারতের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, ভারতের ক্ষতিসাধন করতে কী চেষ্টা করেছেন, তা সবার জানা। এই বিতর্কিত মুখকে হঠাৎ তাদের পোস্টারে ঠাঁই দেওয়া হলো কেন? কেরল বিজেপির পক্ষ থেকে সঠিকভাবেই দাবি করা হয়েছে, বামপন্থীদের রক্তে দেশদ্রোহিতা। এই ঘটনা তারই প্রতিফলন। কংগ্রেস আবার তাদের কোলে ঝোল টেনে দাবি করছে, মহিলা সমিতির যুক্তিতেই তাহলে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছবিও তাদের পোস্টারে আসা উচিত। তাঁর নাম নেই কেন? এখানে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার আরও একটি বড়ো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আজ এই দুই দল একত্রে মিললেও কেরলে এরা আজও শাসক ও বিরোধী। সুতরাং যুযুধান এই দুই পক্ষ স্রেফ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বা এই রাজ্যে কাছাকাছি এলেও ক্ষমতার তাগিদে কেরলে পরস্পরের প্রতিপক্ষ। তাই কংগ্রেসের এই মন্তব্য দুই দলেরই সুবিধাবাদী অবস্থানই প্রকট করে। যাইহোক, পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই, দেশের স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি স্লোগান তুলেছিল : 'পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।' স্বাধীনতার আগে মুসলিম লিগের বিশ্বস্ত বন্ধু কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতার পর কেরলেই মুসলিম লিগের সঙ্গে জোটে গিয়েছিল। সুতরাং মুসলিম লিগের হাত ধরে কমিউনিস্টদের পাকিস্তান-প্রীতি বহু পুরোনো। □

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মোদী সরকারের মনোবল বৃদ্ধি পাবে

আনন্দ মোহন দাস

দেশের অর্থনীতিতে আর্থিক লেন- দেনের ক্ষেত্রে কারেন্সির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর গতিবিধির উপর দেশের অর্থনীতি প্রভাবিত হয়। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো নোটবন্দি। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে এবং তা দেশের পক্ষে অবশ্যই মঙ্গলজনক বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন। এর উল্লেখযোগ্য ভালো দিকগুলি হলো :

(১) **কালোটাকার পরিমাণ হ্রাস :** পরিসংখ্যানে দেখা যায় ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে কালোটাকার পরিমাণ জিডিপির প্রায় ২০ শতাংশ এবং সম্প্রতি শীর্ষ আদালতে দাখিল করা রিট পিটিশনে আনুমানিক ন'শো লক্ষ কোটি টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধুমাত্র অপরাধমূলক কাজে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে নাকি ২২ হাজার কোটি কালোটাকা রয়েছে। অসমর্থিত খবরে প্রকাশ, বিদেশের সুইস ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকে ভারতীয়দের প্রায় তিনশো লক্ষ কোটি কালোটাকা মজুত রয়েছে। সুতরাং দেশের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ কালোটাকার সার্কুলেশন কমাতে না পারলে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়তে বাধ্য। সমান্তরাল অর্থনীতি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। নোটবন্দির ফলে দেশে কালোটাকার পরিমাণ কমতে বাধ্য। কারণ এই পরিমাণ হিসাব বহির্ভূত টাকা ব্যাংকে জমা করলে অর্থনীতির মূল ধারায় তা ফিরে আসে। ২০১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল সংসদে জানিয়েছিলেন নোটবন্দির ফলে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার কোটি কালোটাকার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে বলে অনুমান। অর্থনীতির মূল ধারায় হিসাববিহীন কালোটাকা ফিরে এলে দেশ বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হয়। যেমন আয়কর, জিএসটি-সহ বিভিন্ন কর সংগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের আয় বৃদ্ধি পায় এবং সরকার তা দেশের উন্নয়নে খরচ করতে পারে। সরকারের দেনার পরিমাণ হ্রাস পায়। সরকারের আয় বৃদ্ধির ফলে আয়করের হার হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তথ্যসূত্র মারফত জানা যায়, নোটবন্দির পর প্রায় ৯১ শতাংশ নতুন করদাতা যুক্ত হয়েছেন এবং ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন দাখিল প্রায় ২৫.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা আয়কর ফাঁকি দিতেন এরকম ১৭ লক্ষ ৯২ হাজার ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পেরেছে আয়কর দপ্তর। বর্তমানে আয়কর ও জিএসটি সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নোটবন্দির সুফল হিসেবে ধরা যায়। নোটবন্দির পর তিন লক্ষ শেল কোম্পানি বন্ধ হওয়ায় হাওলার মাধ্যমে মানি লন্ডারিং কমেছে।

(২) **মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস :** নোটবন্দিতে বাতিল নোট ব্যাংক ব্যবস্থায় জমা হলে বাজারে আর্থিক জোগান হ্রাস পায়। নগদ টাকার পরিমাণ কমে যাওয়ায় বাজারে মানুষের চাহিদার পরিমাণ কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

(৩) **জালনোট হ্রাস পায় :** ৫০০, ১০০০ টাকার নোট বাতিলের ফলে এই ডিনোমিনেশনের জাল নোটগুলি বাজারে অচল হয়ে যায়। সুতরাং নোটবাতিলের ফলে জালনোট কারবারিরা বিপদে পড়ে। বাজার থেকে জালনোট হ্রাস পেলে সাধারণ মানুষ ও সরকার উপকৃত হয়। সমান্তরাল অর্থনীতির প্রকোপ কমে যায়।

(৪) **ব্যাংক ঋণে সুদের হারে হ্রাস :** নোটবন্দির পর ব্যাংকে টাকা জমা হওয়ার ফলে ব্যাংক ডিপোজিট বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নোটবন্দির পর প্রায় ৩০ কোটি নতুন ব্যাংক খাতা খোলা হয়। জিরো ব্যালেন্স ও জনধন খাতায় বিপুল পরিমাণ টাকা জমা হয়। মানুষের সঞ্চয়ের অভ্যাস বৃদ্ধি পায়। ব্যাংকিং চ্যানেলে অতিরিক্ত টাকা জমার ফলে এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে জমাকৃত অর্থে ব্যাংকগুলি কম সুদে ঋণ প্রদান করতে সক্ষম হয়।

(৫) **ডিজিটাল লেন-দেন বৃদ্ধি :** নোট বাতিলের ফলে নগদ টাকার লেন-দেন কমে ডিজিটাল লেন-দেন (UPI, Google pay, Paytm, PhonePe etc.) বৃদ্ধি পায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় এই ধরনের লেন-দেন ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৬) **সন্ত্রাসবাদ ও অপরাধমূলক কাজ হ্রাস পায় :** গোয়েন্দা রিপোর্টে কেন্দ্রীয় সরকার জানতে পারে যে উগ্রপন্থীদের কাছে বিপুল পরিমাণ উচ্চ ডিনোমিনেশনের নোটের ভাণ্ডার রয়েছে এবং সীমান্ত পারের উচ্চ ডিনোমিনেশন নোটের বেআইনি অর্থের জোগান বন্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের আশু প্রয়োজন ছিল।

নোট বাতিলের ফলে উগ্রপন্থী ও সমাজবিরোধীদের অর্থ ভাণ্ডার নষ্ট হয়ে যায়।

আদালতের রায়ে প্রমাণিত, বিরোধীরা এতদিন মিথ্যা প্রচারকে হাতিয়ার করে নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির বিরুদ্ধে নির্লজ্জ আক্রমণ শানিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে বিরোধীদের মুখ পুড়েছে।

ফঃ ২

এই ধরনের অপরাধমূলক কাজে অর্থের জোগান বন্ধ হলে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ অনেকাংশে কমে যায়। আমরা কাশ্মীরের কথা উল্লেখ করতে পারি যেখানে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ হ্রাস পেয়েছে এবং সেনাবাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে ইট, পাথর ছোঁড়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই সাহসী ও মহতী উদ্যোগের বিরোধিতা করে দেশের বেশিরভাগ বিরোধী দল নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে যথাক্রমে ১৯৪৬, ১৯৭৮ ও ২০১৬ সালে নোটবন্দির মতো কঠোর ও সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে স্বার্থের পরিপন্থী নোট বাতিলের অপ্রিয় সিদ্ধান্ত অসাধু ব্যক্তি ও কালো তালিকাভুক্ত সংগঠনের কাছে কখনোই পছন্দ হয় না। বিশেষ করে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি, কালোবাজারি, আয়কর অপরাধী, জালনোট কারবারি, উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদী ও আর্থিক অপরাধীদের কাছে এটা একেবারেই অপছন্দের ব্যাপার। স্বাভাবিকভাবেই এদের থেকে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদের সুর শোনা যায়। বিভিন্ন সময়ে নোটবন্দির সিদ্ধান্ত হলেও সবচেয়ে বেশি পরিকল্পিত প্রতিবাদ লক্ষ্য করা গেছে ২০১৬ সালে, যখন নরেন্দ্র মোদী আকস্মিকভাবে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই সময় বেশ কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দলও নোটবন্দির সিদ্ধান্তকে হাতিয়ার করে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোট বৈতরণী পার হবার বিফল প্রয়াস করেছেন। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে মোদীর দলকে অধিক সংখ্যক সাংসদ নির্বাচিত করে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। ঘোলাজলে মাছ ধরতে বিশেষ করে রাহুল গান্ধী ওই সময় রাফেল বিমান ক্রয় এবং নোট বাতিলকে নির্বাচন বিষয় বানিয়ে দেশব্যাপী প্রচার অভিযান চালিয়েয়েন। কিছু রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষীমহল দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেছেন। সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে হিংসাত্মক আন্দোলনে শামিল করেছেন। এমনকী কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী এর বিরুদ্ধে বিদেশেও প্রচার করেছেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের আকস্মিক ঘোষণায় গরিব মানুষ খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কারণ তাদের কাছে ১০০০ ও ৫০০ টাকার নোটের পরিমাণ খুব সামান্যই ছিল বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। বরং লক্ষ্য করা গেছে বেশিরভাগ গরিব মানুষ মোদীর এই কঠোর পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা নোট বাতিলের এই সিদ্ধান্তকে বড়োলোকেদের আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে সরকারের সঠিক লড়াই হিসেবে দেখেছেন। সেজন্য ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা দু'হাতে মোদীকে আশীর্বাদ করেছেন। নোটবন্দির আকস্মিক সিদ্ধান্তে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কালোবাজারি, জালনোটের কারবারি, কালোটাকার ব্যবসায়ী, আয়কর ফাঁকিবাজ, উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীরা। প্রকৃতপক্ষে নোট বাতিলের অপ্রিয় সিদ্ধান্তে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে। প্রসঙ্গত আরও বলা যায় বেহিসেবি ফান্ড সংগ্রহের ফলে বেশ কিছু রাজনৈতিক দলও এই ধরনের ডিনোমিনেশনের নোট বাতিলে বিপাকে পড়েছে বলে আর্থিক মহল মনে করেছেন। সেজন্য নোট বাতিলের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মহলকে বিভিন্ন সময়ে দেশব্যাপী নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করতে দেখা গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনে সুফল না পাওয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন মিলে শেষ অস্ত্র হিসেবে শীর্ষ আদালতে মোদী সরকারকে আইনিভাবে পর্যুদস্ত করতে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। কিন্তু গত ২ জানুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ আদালত মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট ৮ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে নরেন্দ্র মোদী সরকার ঘোষিত নোটবন্দির সিদ্ধান্তকে বৈধ আখ্যা দিয়ে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন ৫৮টি আবেদন পত্র শীর্ষ আদালতে দাখিল করেছিল। সমস্ত আবেদন যথার্থ বিচার করে সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করেছেন। সুতরাং এই ঐতিহাসিক রায়ে মোদী সরকারের নৈতিক জয় হয়েছে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কালোটাকা উদ্ধারের লড়াইয়ে সরকারের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য (৪-১) একমত হয়ে রায় দিয়েছেন কালোটাকা ও জালনোট উদ্ধারের এবং উগ্রপন্থীদের অর্থভাণ্ডার নষ্ট করতে মোদী সরকারের ৫০০ ও ১০০০ টাকা নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ছিল আইন সঙ্গত ও ত্রুটিহীন। এটি সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ বলে সকল বিচারপতি একমত হয়েছেন। একজন বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করলেও এই নির্দিষ্ট বিষয়ে একমত হয়েছেন। একমাত্র বিচারপতি বিভি নাগরত্না অন্য বিষয়ে একমত হলেও সিদ্ধান্তটির বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে বলে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কারণ তিনি ১৯৪৬ ও ১৯৭৮ সালে আইন পাশের মাধ্যমে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে মতামত দিয়েছেন। যদিও গরিষ্ঠ সংখ্যক বিচারপতি রায়ে (৪-১) উল্লেখ করেছেন নোটবাতিল ঘোষণার জন্য সরকারের অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতা হয়েছে।

সুতরাং নোটবন্দির আগে সংসদে আইন পাশ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গরিষ্ঠ সংখ্যক বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কারণ আগে বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে উদ্দেশ্য পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়াত বলে বিচারপতিরা মনে করছেন। সেজন্য মোদী সরকারের ঘোষিত ২০১৬ ডিসেম্বরের অর্ডিন্যান্স ও ২০১৭-এর আইনকে সুপ্রিম কোর্ট বৈধ আখ্যা দিয়েছেন। কারণ আরবিআই আইনের ২৬ (২) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার রয়েছে। মোদীর বিরুদ্ধে বিরোধীদের হঠকারী সিদ্ধান্তের অভিযোগকেও নস্যাৎ করে বিচারপতিরা রায়ে উল্লেখ করেছেন যে নোটবন্দির আগে ৬ মাস ধরে রিজার্ভ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি যথোপযুক্ত সলাপরামর্শ করেছেন এবং তারপর কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সুতরাং এই অভিযোগটিও ধোপে টেকেনি।

উল্লেখনীয় যে, ১৯৭৮ সালে বাতিল নোট জমা করার জন্য মাত্র আট দিন সময় দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ২০১৬ সালে এই সময়টি ৫২ দিন রাখার ফলে বিচারপতিরা সময়ের পরিমাণকে পর্যাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ফলে অভিযোগটি অমূলক ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। আদালতের রায়ে প্রমাণিত যে, বিরোধীরা এতদিন মিথ্যা প্রচারকে হাতিয়ার করে নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির বিরুদ্ধে নির্লজ্জ আক্রমণ শানিয়েছে। সন্দেহ নেই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিরোধীদের মুখ পুড়েছে। নরেন্দ্র মোদীর সরকারের বিরুদ্ধে কোনোরকম ইস্যু খুঁজে না পাওয়ায় বিরোধীরা এতদিন নোটবন্দির ফাটা রেকর্ড বাজিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই আদেশে নরেন্দ্র মোদী কঠোর ও সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে আরও বেশি উৎসাহিত হবেন কোনো সন্দেহ নেই। নোটবন্দির বিরুদ্ধে প্রচারের বিরাম দিয়ে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের হয়তো নতুন কোনো ইস্যু খুঁজতে হবে।□

মান্যতা দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত

মোদীর সিদ্ধান্তে সিলমোহর, নোটবন্দি বৈধ

বিশ্বপ্রিয় দাস

অবশেষে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মান্যতায়, দেশের ক্ষেত্রে ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর ঘটা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা স্বীকৃতি পেল। তাঁদের মতে দেশের তৎকালীন নরেন্দ্র মোদী সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত বৈধ ছিল। এমনটাই জানাল দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পাঁচ সদস্যের বোর্ডের মধ্যে চার সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে।

শুরুতে যেমন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এই সিদ্ধান্ত। রায় ঘোষণার পরেও সেই বিষয়টাতে অবশ্য ধামা চাপা পড়েনি। তবে বিরোধিতায় যারা শুরুর সময় থেকে নেমেছিলেন, তাঁদের মুখে যে একটা ঝামা ঘষার পরিস্থিতি তৈরি হলো, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। আর দেশের শাসক দল যে এটা নিয়ে বিরোধিতায় যারা ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্রে শান দিয়ে অচিরেই রাস্তায় নামেন সেটাই বলা বাহুল্য।

আদালত তাঁদের রায় ঘোষণা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত ১৯৭৮ সালের নোট বাতিলের কথা এনেছেন। এও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সেটাকেও মান্যতা দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সালটা ছিল ১৯৮০। তখন সময় লেগেছিল মাত্র দুই বছর। এক্ষেত্রে লাগল প্রায় ছয় বছর। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে স্বাধীন ভারতের জনগণ প্রথম দেখেছিল নোট বাতিল। বাতিল হয়েছিল এক হাজার, পাঁচ হাজার ও দশ হাজারের নোট। সে সময় ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল এই কারেন্সি ফেরত দেবার। ক্ষমতায় ছিল জনতা দলের সরকার। সেই সময় মানুষ হাতে পেয়েছিলেন সেই অর্থে মাত্র সাত দিন। এবারে মোদী সরকারের ক্ষেত্রে সময় ছিল ৫২ দিন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই সময়টাকে যথেষ্ট বলে মনে করেছে। আমাদের দেশে ১৯৪৬ সালেও নোট বন্দির ঘটনা ঘটেছিল। সেটি অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের আমলে। একটি ইংরেজি সংবাদমাধ্যমে সেই সময়ের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা বলছেন, সোনার দাম বাড়ার পাশাপাশি নগদ টাকা খোলা বাজারে বিক্রি হয়েছে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ দামে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, কালোটাকা বাজারে সাদা হবার একটা প্রবাহ সেই সময়ে দেখা গিয়েছিল, যেটা ভীষণ মাত্রায় ২০১৬ সালেও দেখা গিয়েছে। তবে খোলাবাজারে নয়। টাকা বদলানোর জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়েছেন মানুষ। এক ধাক্কায়, অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, একদিকে যেমন দেশের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয়নি বা একটা ধারণা তৈরি করতে তাঁরা পেরেছিলেন যে, দেশের বাজারে নগদ টাকার পরিমাণ কত।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেটি দেশে কালোটাকার গতিপ্রকৃতিকে রোধ করা, আর কালোটাকার কারবারিদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা। নকল টাকার সাহায্যে অর্থনীতিকে ধ্বংস করার যে খেলা চলছিল, তাকে প্রতিরোধ করা, সন্ত্রাসবাদীদের হাতে দেশের টাকা ঘুর পথে চলে যাওয়াকে বাধা দেওয়ার জন্য মোদী সরকার যে এই পথ ধরে দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে চেয়েছেন, আর সেই পথ ধরতে যে ভুল করেনি। সে কথা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে।

দেশের বিরোধীদের কথায় আসি। দেশের মধ্যে প্রথম নোটবন্দির বিরোধিতায় নেমেছিলেন একদিকে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী, আর একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি। এমনকী পরের বছর ৮ নভেম্বর দিনটাকে তাঁরা 'অ্যান্টি ব্ল্যাক মানি ডে' হিসেবে

পালন করলেও উচ্চবাচ্য করেনি দেশের মোদী সরকার। দেশের অন্যতম জাতীয় দলের নেতা ও আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই নোটবন্দির পরে যে ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, তাঁরা কি এবার ক্ষমা চাইবেন? এই প্রশ্ন উঠেছে। সে খবর ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদপত্র মারফত আমজনতা জেনেও গেছেন। গত বছরগুলিতে দেশের বিজেপি সরকার কখনও তাঁদের সাফল্যের খতিয়ানে একবারের জন্য আনেনি এই নোটবন্দির কথা।

নোটবন্দির পিছনে যে কারণগুলি একেবারেই ভীষণ ভাবে সফলতার মুখ দেখেছে পরবর্তী সময়ে, তার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করার মতো বিষয় ডিজিটাল লেন-দেনের বিষয়টা। গত কয়েক বছরে এটা এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে আজকের মানুষ এই লেন-দেনে ছাড়া ভাবতেই পারে না। আঞ্চলিক খুচরো দোকান থেকে পাড়ার ফুচকা বিক্রেতার কাছেও যেমন করা যাচ্ছে এই লেন-দেন, তেমনই অনলাইনে কেনাকাটা থেকে শুরু করে যে কোনো লেন-দেন আজ এক অপরিহার্যের চেহারা নিয়েছে ডিজিটাল লেন-দেন। আর এখানেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার স্বপ্ন কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। রিজার্ভ ব্যাংকের দেওয়া একটি পরিসংখ্যানে জানা যাচ্ছে যে বাজারে নগদের পরিমাণ প্রায় ৮৩ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। ২০১৬ সালের নোটবন্দির ঘোষণার ঠিক আগের মুহূর্তে বাজারে নগদ ছিল ১৭.৭৪ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২২ সালের একেবারে শেষে, ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তার পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ৩২.৪২ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান দিয়ে বিরোধীরা বলছেন বাজারে কি সেইমত টাকা ফিরেছে? তাঁরা একটি বিষয় হয়তো বুঝতে পারছেন না বুঝতে চাইছেন না যে, যখন ডিজিটাল লেন-দেন বৃদ্ধি পায়, তখন বাজারে নগদের পরিমাণ যে একটু হলেও বৃদ্ধি ঘটবে সেটা তো বলাই বাহুল্য। ২০১৬ সালে নোটবন্দির ফলে যে টাকা ফেরত এসেছিল সেটার পরিমাণ দেখে, সেই সময়ের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে এটা প্রমাণিত যে সিংহভাগ টাকাই ফেরত এসেছিল। আর সামান্য পরিমাণ টাকা বাজারে রয়ে গিয়েছিল। আর নকল টাকার প্রায় সবটাই উধাও হয়েছিল বাজার থেকে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতির। এটার কারণ আর কিছুই নয়, সেই ডিজিটাল লেন-দেনের ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা বেড়ে চলা।

এবার আসা যাক কালোটাকার কথায়। রাজ্যের সুপ্রিমো বা তার সাগরেদরা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর মুখ খুলেছেন। তাঁরা বলছেন, সব কালোটাকা উদ্ধার হয়নি। ঠিকই তো। দক্ষিণ কলকাতার এক মন্ত্রী ঘনিষ্ঠের প্রিয়জনের কাছ থেকে মিলেছে এক ধাক্কায় ২৮ কোটি। এগুলি কি সব সাদা টাকা? রাজ্যসভার সাংসদমশাই, উক্তি করার আগে নিজের দিকে আঙুল তুলুন। আর দেখুন আপনার বীরভূমের বীরপুঙ্গবের কাছে যত টাকার হদিশ মিলছে, সেগুলি কি সব সাদা? এ ছাড়াও তাঁর আরও মন্ত্রী বা সিন্ডিকেটের ভাইয়েদের কাছে ঐশ্বর্যের যে ভাণ্ডার, সেগুলি সব সাদা? ওই সাংসদ আরও বলেছেন, সন্ত্রাসবাদীদের কাছে টাকা যাওয়া থামেনি? আপনার কাছে এই এই প্রশ্ন করা যেতেই পারে? আপনার দলের পরিচালিত সরকার কি লক্ষ্য রাখতে পারেননি সেই সব সন্ত্রাসবাদীর, কলকাতার মোমিনপুরের কাছে, যেখানে গত বছর লক্ষ্মী পুজোর সময় এক ধর্মীয় হানাহানির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, সেই অঞ্চল থেকেই এনআইএ ধরল সন্ত্রাসবাদীদের, উদ্ধার হলো লক্ষ লক্ষ টাকা। আর একটা সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে এই কলকাতায় বসেই নিয়ন্ত্রণ হতো সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। তার উত্তরে তিনি কি বলবেন? বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ অবশ্য বলেই দিয়েছেন যে কালোটাকা আটকে দেওয়ায় সবচেয়ে ধাক্কা খেয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা। কেননা তাঁদের হাতে ভারতীয় টাকার প্রবাহ অনেকটাই কমেছে। এর কারণ কালোটাকার পরিমাণ কমেছে বাজারে। ওই সাংসদ আরও বলেছেন যে ওই নোটবন্দির কারণে নাকি ছোটো ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের খুব ক্ষতি হয়েছে। আচ্ছা, উনি কি লক্ষ্য করেননি ডিজিটাল লেন-দেনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা তাঁদের পণ্য দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে? আচ্ছা, সাংসদমশাই, এটাতে কত ক্ষতির মুখ দেখল দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা? বিরোধীরা একবার অন্তত চোখ বন্ধ করে, রাজনীতির আঙিনা ছেড়ে ভাবুন, দেখবেন এই নোটবন্দি আমাদের দেশের কতটা উপকারে এসেছে। □

পাকিস্তানও কি এবার তালিবানের হাতে!

দিগন্ত চক্রবর্তী

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বহু প্রতীক্ষার পর স্বাধীনতা এসেছিল কিন্তু খণ্ডিত হয়ে গেছিল স্বপ্নের ভারত। কারণ একদল তখন তাদের ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য আলাদা দেশের দাবি করেছিল। সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানের। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট অখণ্ড ভারতের পূজারি শ্রীঅরবিন্দ তামিলনাড়ু ত্রিচিরাপল্লি বেতারকেন্দ্র থেকে স্পষ্টভাবে ভারতের অখণ্ডতার কথা বললেও দেশভাগ আটকানো যায়নি। দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সেদিন শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যারা ভারতকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে একদিন তারাও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বেশিদিন নয়, মাত্র ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালেই পাকিস্তান খণ্ডিত হয়ে তৈরি হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। আর এখনও পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে। যেমন বালুচিস্তান। সত্যিই, মনীষীদের বাণী যে কখনো বৃথা হয় না তার প্রমাণ আমরা আজও পেয়ে চলেছি।

বালুচিস্তান তো বহুদিন ধরেই স্বাধীনতার দাবি তুলেছে। এবার আরও এক অন্তঃকলহের মধ্যে পড়েছে পাকিস্তান। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তেহেরিকে তালিবান সম্প্রতি তাদের ক্যাবিনেট মিনিস্ট্রি গঠন করেছে। স্বরাষ্ট্র, আইন, শিক্ষা, অর্থ প্রকৃতি মন্ত্রকের জন্য আলাদা আলাদা মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেছে তারা। অর্থাৎ বলা যেতে পারে পাকিস্তানের ওপর সরাসরি চ্যালেঞ্জ এনেছে এই সংগঠন। যে সন্ত্রাসবাদের পক্ষে বরাবর বিশ্বমঞ্চে সওয়াল করে এসেছে এখন তাদেরই হাতে বিপর্যস্ত পাকিস্তান । অর্থাৎ যাদের একদিন তারা মাথায় তুলেছিল আজ তারাই মাথা ব্যাথ্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শাহবাজ শরিফদের।

কী এই তেহেরিকে তালিবান বা টিটিপি? এটি প্রধানত পাকিস্তান আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সক্রিয় একটি জঙ্গি ইসলামি সংগঠন। টিটিপির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ থেকে পাকিস্তানি সরকারকে উচ্ছেদ করে সেখানে শরিয়া শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। এই লক্ষ্যে তারা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে লড়াইরত অন্যান্য ছোটো বড়ো একাধিক জিহাদি গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করছে। সদস্য সংগ্রহের জন্য টিটিপি মূলত আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তের উপজাতীয় অঞ্চলের উপর নির্ভর করে। সেখান থেকে জনবল সংগ্রহ করে তারা নিজেদের বাহিনীতে নিয়োগ করে। টিটিপি আলকায়েদার কাছ থেকে আদর্শগত দিকনির্দেশনা পায় এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

গত বছরই আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা কায়েম করেছে তালিবান। আর তাদের সঙ্গেই জোট রয়েছে এই তেহেরিকে তালিবানের। আফগানিস্তানে যখন তালিবানরা সরকার গঠন করেছিল তখন পাকিস্তানের বেশিরভাগ মানুষকে তার সমর্থন করতে দেখা গিয়েছিল। তার কারণও রয়েছে বহু। পাকিস্তানের মতো দেশের মানুষ যারা একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগেও মহিলাদের পড়াশোনার বিরুদ্ধে, যারা এখনো নারীদের পদদলিত করে রাখতে চায়, তাদের সেই নীচ মানসিকতা সম্পন্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিল তালিবান সরকার।

অপর একটি কারণ হচ্ছে শরিয়া আইন। তালিবান ক্ষমতায় আসার পর আফগানিস্তানে চালু হয়েছে শরিয়া আইন। সমীক্ষা করে দেখা গেছে পাকিস্তানের ৬৭ শতাংশ মানুষ শরিয়া আইনের পক্ষে। শুধুমাত্র পক্ষেই তা নয়, তাদের মতে একমাত্র শরিয়া আইন চালু থাকা উচিত। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে পাকিস্তান তালিবানের হাতে গেলেও সেখানকার বেশিরভাগ মানুষের তাতে সমর্থনই থাকবে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, পাকিস্তানি তালিবানরা সরকার গঠন করলে তার প্রভাব ভারতের উপর কী রকম হবে! এক্ষেত্রে বলতে গেলে প্রথমেই বলে রাখা ভালো পাকিস্তানের যা অবস্থান সেই অনুযায়ী বিচার করলে পাকিস্তানের বেশ কিছু অংশ তালিবান দখল করতে পারলেও পঞ্জাব প্রদেশটি দখল করা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। ফলে সেক্ষেত্রে ভারতের ওপর তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। কিন্তু যদি পঞ্জাব প্রদেশটি তালিবানের দখলে চলে আসে তাহলে সেটা শুধুমাত্র ভারত নয়, গোটা বিশ্বের কাছে একটি চিন্তার বিষয়। কারণ পাকিস্তানের পরমাণুবোমা যদি তালিবানের হাতে চলে যায় তাহলে তার ফল কীরূপ হতে পারে সেই শঙ্কা রয়েছে সমগ্র বিশ্বের তাবড় নেতাদের মনে। বর্তমানে পাকিস্তানের পরিস্থিতির অবনতি যেভাবে ঘটছে তাতে করে বিশ্বের সামনে উঠে আসছে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব।

জন্ম হলে মৃত্যু হবেই। আর ভারতবর্ষ ভেঙে যে দেশের জন্ম, তাদেরও যে একদিন ধ্বংস নিশ্চিত তার ইঙ্গিত হয়তো এই ঘটনাগুলিই।

পুলিশের অসভ্যতায় কলঙ্কিত পশ্চিমবঙ্গ

মণীন্দ্রনাথ সাহা

বিরোধীরা প্রায়ই বলে থাকেন পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র, মানবাধিকার বলে কিছু নেই। আর শাসক দলের প্রধান গলার শিরা ফুলিয়ে বলেন—পশ্চিমবঙ্গে যতটা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রয়েছে তা দেশের আর কোনও রাজ্যেই নেই। অথচ সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারে আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবাদের ফলে যে ঘটনা ঘটল তা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

গত ৩০ ডিসেম্বর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে নন্দকুমার বিডিয়ো অফিসে ডেপুটেশন দিতে আসেন সিপিএম

(ফাইল চিত্র)

কর্মী সমর্থকরা। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তারপর তারা মহিষাদল-নন্দকুমার রাজ্যসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে সিপিএম কর্মীদের সঙ্গে বচসা বেধে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে নন্দকুমার ও সংলগ্ন একাধিক থানার পুলিশ। অবরোধ তুলতে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। অবরোধকারী মহিলাদের জোর করে টেনে তুলে দেয়। আন্দোলনকারীরাও পালটা প্রতিরোধ শুরু করেন। তখন দু' পক্ষের মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ। তাতে জখম হন পাঁচ পুলিশকর্মী। তারপর পুলিশ সিপিএম নেতা পরিতোষ পট্টনায়ক, জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি-সহ সাতজনকে আটক করে।

এই খবরটি একটি সাহসী দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। যে দৈনিকে প্রথম পৃষ্ঠায় সবার উপরে লেখা থাকে 'পাঠকের কাছে দায়বদ্ধ।' কিন্তু একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের ভিডিয়োতে দেখা গেছে পুলিশকে আক্রমণের কোনো ছবি নেই। পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে এক মহিলা পুলিশ অফিসার লাঠি হাতে এক প্রতিবাদী মহিলার দিকে তেড়ে এসে মহিলার কাপড় টেনে তাঁকে উলঙ্গ করার চেষ্টা করছেন। এবং একজন পুরুষ পুলিশ অফিসার ওই মহিলাকে লাঠি দিয়ে মারছেন। প্রতিবাদী মহিলা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য। অথচ ওই সাহসী সংবাদপত্র প্রতিবাদিনীর বস্ত্রহরণের দৃশ্যের কথা বেমালুম চেপে গেছে। তাহলে পাঠকের কাছে সংবাদপত্রের কীসের দায়বদ্ধতা? প্রকৃত সংবাদ প্রকাশের না গোপনের দায়বদ্ধতা? এতে পাঠকের মনে হতেই পারে যে সাহসী সংবাদপত্রও শেষ পর্যন্ত শাসকের কাছে বিক্রি হয়ে গেল নাকি?

তবে পুলিশের এই আচরণে আশ্চর্যের কিছু নেই। রাজ্যে পুলিশ অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক কিছু করে দেখাতে পারে। যেমন ইতিপূর্বে দেশবাসী বা বলা ভালো বিশ্ববাসী দেখেছে পুলিশকে কুকুরের ভূমিকা পালন করে চাকরীপ্রার্থী প্রতিবাদীদের কামড়াতে। এবারে দেখা গেল প্রতিবাদী মহিলার বস্ত্রহরণ করতে। এই সমস্ত বীর-বীরাঙ্গনা পুলিশেরা নিরীহদের ওপর প্রবল বিক্রম প্রদর্শনে অভ্যস্ত। কিন্তু এরাই যখন উড়ন্ত লুঙ্গির ছুটন্ত লাথি খান তখন তারা নীরবে ইঁদুর বনে যান। তখন আর উড়ন্ত লুঙ্গির ছুটন্ত লাথির বিরুদ্ধে এইসব ক্লীব-দু'পেয়েদের ক্ষমতা প্রদর্শনের সাহস হয় না। তখন সুড় সুড় করে গর্তে আশ্রয় নেয়। একজন মহিলা পুলিশ অফিসার কোন স্পর্ধায় একজন মহিলার কাপড় টেনে খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তা সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ক্ষমতার দম্ভে তিনি কি একজন নারী হয়েও নারীর মর্যাদা ভুলে গেলেন?

এতদিন পুলিশ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির যে কোনো কর্মসূচিতে বাধা দিয়ে বা বিজেপি কর্মীদের মেরে ধরে তাদের কর্মসূচি বাতিল করার চেষ্টা করেছে বা কোথাও কোনো কার্যক্রমের অনুমতি দিয়ে পরে আবার সেই অনুমতি বাতিল করেছে। কিন্তু এখন তারা সেই পথ থেকে সরে এসে সমস্ত বিরোধী দলের প্রতিবাদীদের জন্য একই পথ অবলম্বন করেছে। তাতে মনে হচ্ছে পুলিশ, বলা ভালো সরকার ভীষণ ভয় পেয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক পথে সরকারের কোনো নীতি বা কর্মের বিরুদ্ধে যে কেউ প্রতিবাদ করতে পারে। কিন্তু রাজ্যের শাসক গণতান্ত্রিক প্রতিবাদে ভয় পেয়ে প্রতি ক্ষেত্রেই পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে প্রতিবাদীদের কণ্ঠস্বর বন্ধের আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।

পুলিশ যদি মনে করে প্রতিবাদী মহিলাদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে তাদের প্রভুকে বাঁচাবে তাহলে তারা ভুল করবে। পুলিশ যেন মনে রাখে, মহাভারতের যুগে প্রবল প্রতাপশালী দুরাচার দুর্যোধন-দুঃশাসনরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে রক্ষা পায়নি। তারা সবংশে নির্বংশ হয়েছে। এই রাজ্যেও দুঃশাসনরাজের সময় শেষের পথে এগিয়ে চলেছে। আধ্যাত্মিক ভারতে নারীর অসম্মান করে কারও জয়লাভ করার কোনও নজির নেই। বর্তমান দুঃশাসনের রাজত্বেও সেটা হবে না। দুঃশাসনদের পরাজয় হবেই হবে। □

কলেজিয়াম ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

ভারতে কলেজিয়াম ব্যবস্থা 'বিচারককে নির্বাচন করেন' বলেও উল্লেখ করা হয়, এটা এমন এক ব্যবস্থা যাতে শুধুমাত্র বিচারকরাই বিচারকদের নিয়োগ এবং স্থানান্তর করেন। ব্যবস্থাটা সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে, সংসদে পাশ করা আইন বা সংবিধানের কোনো বিধান অনুসারে নয়।

আরও বিশদে বললে কলেজিয়াম সিস্টেম হলো তাই যার অধীনে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও ট্রান্সফার একটা ফোরাম নির্ধারণ করে। সেই ফোরামে ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের চারজন সিনিয়র বিচারক থাকেন। এইভাবে বিচারকরা নিজেদের মধ্যে বিচারকদের পদগুলো বিলি ব্যবস্থা করে নেন। অথচ ভারতের মূল সংবিধানে বা পরবর্তী কোনো সংশোধনীতে কোথাও এই ধরনের কোনও উল্লেখ (কলেজিয়ামের) করা হয়নি। বরং সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত হয়েছিল, 'রাষ্ট্রপতি এই উদ্দেশ্যে যেমনটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন, তেমনভাবেই সুপ্রিম কোর্ট এবং রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারকদের সঙ্গে পরামর্শের পর সুপ্রিম কোর্টের প্রত্যেক বিচারক বহাল থাকবেন যতক্ষণ না তিনি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পৌঁছন।

ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা বিচারক নিয়োগকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখতে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারকদের সঙ্গে পরামর্শের বিধান রেখেছিলেন। তবে শেষ সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সংবিধান গণতান্ত্রিক ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের পরামর্শ বাধ্যতামূলক করেনি। এর সরাসরি মানে দাঁড়ায় যে কলেজিয়াম ব্যবস্থা সংবিধানের বিরোধী এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির অধিকারের পরিপন্থী। এই প্রক্রিয়া অসাংবিধানিক আমরা এটাকে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করি না কেন। এই কারণে ন্যাশনাল জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিশন আইন অবিলম্বে প্রয়োগ করা দরকার। সেটা কী?

২০১৪ সালে, জাতীয় বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন আইন, ২০১৪ (ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিশন, এনজেএসি) আনা হয়েছে— ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে বিচারপতিদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োগ কমিশন গঠন করার সুপারিশ আছে তাতে। এটা বিচারক নিয়োগের কলেজিয়াম ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপিত করবে। এই আইন অনুসারে, প্রধান বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে ছয় সদস্যের কমিশন গঠন করতে বলা হয়েছে। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দুজন সিনিয়র বিচারক, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এবং তপশিলি জাতি/উপজাতি বা মহিলা সম্প্রদায়ের দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত। সংসদও ৯৯তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ২০১৪ পাশ করেছে যা সংবিধানে ১২৪(১) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেছে। এই অনুচ্ছেদে এনজেএসি-এর গঠনের বিধান আছে। 'দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি'র সম্মতি ছাড়া কোনও সুপারিশ করা যাবে না, তাছাড়া কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভেটো প্রদানের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। এর পরে বিষয়টা নিয়ে সাংবিধানিক তদন্ত শুরু হয় এবং তা চতুর্থ বিচারকের মামলার দিকে গড়ায়— সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেটস রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশন বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া, ২০১৫ বা চতুর্থ বিচারকের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এনজেএসি আইন এবং ৯৯তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইনকে অসাংবিধানিক বলে মত দিয়েছে এবং কলেজিয়াম ব্যবস্থাকে বহাল রেখেছে। এতে বলা হয়েছে যে আইনটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো লঙ্ঘন করেছে।

এই কলেজিয়াম ব্যবস্থার ফলাফল কী হয়েছে দেখা যাক।

ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় স্বজনপোষণ এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে কার্যত প্রতি তিন জন হাইকোর্টের বিচারকের মধ্যে একজন অন্য বিচারপতি বা সিনিয়র আইনজীবীর আত্মীয়। অথচ অনুচ্ছেদ ১২৪(১) রাজনৈতিক নির্বাহী রাষ্ট্রপতিকে 'বিচার বিভাগীয় নিয়োগের ক্ষমতা' প্রদান করে এবং ১২৪(২) অনুচ্ছেদ সংসদের আইনসভার উপর 'অপসারণের ক্ষমতা' অর্পণ করে।

ভারতের ২৫টা হাইকোর্ট আছে। তার জন্য ২৫ জন প্রধান বিচারপতি আছেন। দেড় বছর

“ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় স্বজনপোষণ এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে কার্যত প্রতি তিন জন হাইকোর্টের বিচারকের মধ্যে একজন অন্য বিচারপতি বা সিনিয়র আইনজীবীর আত্মীয়। অথচ অনুচ্ছেদ ১২৪(১) রাজনৈতিক নির্বাহী রাষ্ট্রপতিকে ‘বিচার বিভাগীয় নিয়োগের ক্ষমতা’ প্রদান করে এবং ১২৪(২) অনুচ্ছেদ সংসদের আইনসভার উপর ‘অপসারণের ক্ষমতা’ অর্পণ করে।”

আগে পর্যন্ত তার আগের তিরিশ বছরের হিসাব জোগাড় করা গেছে। এই ২৫ জনের মধ্যে ৭ জনই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা বিচারপতিদের পুত্র বা জামাই বা ভাগ্নে, ভাইপো ছিলেন, ৮ জন ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাডভোকেট জেনারেল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের পুত্র বা জামাই বা ভাগ্নে বা ভাইপো। আরও ৫ জন অ্যাডভোকেট জেনারেলের পুত্র বা সিনিয়র অ্যাডভোকেট। ২৫ জনের মধ্য থেকে শুধুমাত্র ৫ জন জেনারেল ক্যাটেগরির। পঁচিশ জনের মধ্যে ৫ জন প্রথম প্রজন্মের আইনজীবী সেখানে ২০ জন পঞ্চম প্রজন্মের আইনজীবী।

দীপঙ্কর দত্ত সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি বম্বে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সলিল কুমার দত্তের পুত্র।

অমিতাভ রায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন তিনি অবসর নিলেন আর সেই খালি জায়গা নিলেন তাঁর শ্যালক।

সুধাংশু ধুলিয়া সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি রাঁচী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি কে সি ধুলিয়ার পুত্র। তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল ৪৯।

জাস্টিস পার্দিওয়ালা হাই কোর্টের কনিষ্ঠতম বিচারপতি ছিলেন, কোনো কোর্টের বিচারপতি ছিলেন না, তাঁর সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ছিল ৬৯ বা ৭০ ক্রমিক সংখ্যা, অথচ তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে পৌঁছে গেছেন। শুধুমাত্র পৌঁছেছেন তাই নয়, তার পদোন্নতি এমনভাবে হয়েছে যাতে তিনি ভবিষ্যতে চিফ জাস্টিস অব ইন্ডিয়া হতে পারেন। বি বি নাগরত্না সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়েছেন তিনি কোনো এক সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতির কন্যা। কন্যাদেরও তো কোটা হওয়া উচিত, শুধু পুত্ররা কেন?

পুরোটাই খোলাখুলি চলছে। বর্তমান ভারতের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড়। তাঁর পিতা যশবন্ত চন্দ্রচূড়ের রেকর্ড আছে তিনি ভারতে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রধান বিচারপতি ছিলেন। পিতাপুত্র দুজনেই ভারতের প্রধান বিচারপতি। তাঁর পুত্রও হাইকোর্টের উকিল। এবং এমন সময়ে তাঁর উন্নতি হবে যাতে তিনিও ওই পদে পৌঁছতে পারেন।

আর এম লোঢা, জিএস সিংভি, দলবীর ভাণ্ডারি তিন জনেই রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। যোধপুরে এক মহল্লা আছে সেখানকার এক জৈন উপজাতি অসোয়াল; তিন জনই এই উপজাতির লোক।

এদের পদোন্নতির সময়ে বয়স হয় ৪৫, ৪৬ বা ৪৭। যাতে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছনোর রাস্তা তাঁদের সামনে খোলা থাকে। আর বাকি যাঁরা তাঁদের বয়স হবে ৪৮,৪৯ বা ৫০ যাতে সেই হতভাগ্যরা কোনও দিনই সুপ্রিম কোর্টে পৌছতে না পারেন।

এলাহাবাদে কায়স্থ ব্যবস্থা চালু আছে। যারা কায়স্থ কোটা থেকে আসবেন তাঁদের বয়স এমন হবে যাতে তাঁরা কম বয়সে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছতে পারেন।

মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে খুশি রাখতে তাঁর কোটা অনুসারেও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন।

এই ব্যবস্থা চলছে ১৯৯৩ সাল থেকে। জাস্টিস ভগবতী বলেছিলেন যে তাঁর ভুল হয়ে গেছে। পৃথিবীর আর কোথাও এইরকম ব্যবস্থা চালু নেই। ▫

With Best Compliments
from -

A
Well Wisher

জয় শ্রীরাম

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। কিন্তু কেন? কিছুদিন আগে ভাটপাড়ায় কিছু লোক সম্ভবত বিজেপি সমর্থক তিনি গাড়িতে করে যাওয়ার সময় জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকেন। এতে উত্তেজিত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে স্লোগান দিতে থাকা লোকদের তাড়া করেন। কিন্তু কেন? এরপর গত বছর নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শেষ হতে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখার জন্য প্রস্তুত হতেই সম্ভবত কিছু বিজেপি কর্মী 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে থাকেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তিনি ভাষণ দিতে অস্বীকার করে নিজের আসনেই বসে থাকেন। অতি সম্প্রতি হাওড়া স্টেশনে 'বন্দেভারত' ট্রেন যাত্রার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তাঁকে মঞ্চে ওঠার এবং বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানানো হলে কিছু বিজেপি কর্মী এবং সমর্থক সম্ভবত 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে শুরু করে। এতে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং মঞ্চে না উঠে নীচে থেকেই নিজের বক্তব্য রাখেন। আমার প্রশ্ন, জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কেন? কোনও সভায় যদি কিছু তৃণমূল কর্মী 'আল্লাহো আকবর ধ্বনি' দিতে থাকে তাহলে তিনি কি ভাষণ দেবেন না, কিংবা সভাস্থল থেকে চলে যাবেন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

চুঁচুড়ার ভ্রাজিষ্ণু

স্বস্তিকা পত্রিকায় ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ অন্যরকম বিভাগে নিজস্ব প্রতিনিধি দ্বারা প্রতিবেদনটি পড়ে মুগ্ধ হলাম। 'চুঁচুড়ার বিস্ময় প্রতিভা দেড় বছরের ভ্রাজিষ্ণু' পড়ে খুব ভালো লাগলো। বয়স মাত্র আঠার মাস, এইরকম একটি বাচ্চা ছেলের বিস্ময়কর প্রতিভা ঈশ্বরের দান ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি এই চুঁচুড়া শহরের বাসিন্দা হয়ে এতে খুবই গর্ববোধ করছি। আমারই প্রিয় শহরের এবং হুগলী জেলার অধিবাসীরা আমার মতোই এই প্রতিভাবান সন্তানের জন্য সবাই খুবই গর্বিত বলেই আমার ধারণা। স্বস্তিকা পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধিকেও ধন্যবাদ জানাই এই রকম একটি বিস্ময়কর প্রতিভাকে খুঁজে প্রতিবেদন লেখার জন্য।

চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত হুগলী জেলার হুগলী শহরের কাপাসডাঙ্গা কলোনির (১নং না ২নং) তা উল্লেখ করা না থাকলেও দিলীপবাবু ও কাকলি দেবীর একমাত্র সন্তানের জন্য ঈশ্বরের কাছে তার দীর্ঘজীবন কামনা করি। ভ্রাজিষ্ণু ভট্টাচার্যের প্রখর স্মৃতিশক্তিকে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে কামনা করি। ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস ও এশিয়া বুক অব রেকর্ডসে এই বিস্ময়কর প্রতিভাবান ভ্রাজিষ্ণু জায়গা করে নিয়েছে জেনে খুব ভালো লাগল। এই বয়সের একটি ছেলে দেশ-বিদেশের মহাপুরুষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম গড়গড় করে বলে দিতে পারে। এই বয়সে অবলীলায় প্রায় দু হাজার ছবি দেখে বলে দিতে পারে সেই ছবির নাম ও খুঁটিনাটি। কঠিন কঠিন দেশের নাম শুনে সে দেখিয়ে দেয় গ্লোবে সেই দেশের অবস্থান কোথায়? সর্বকনিষ্ঠ স্মৃতিধর ভ্রাজিষ্ণু ভট্টাচার্যকে তাঁর প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য আমি তাকে এই লেখার মাধ্যমে অভিনন্দন জানাই। ভবিষ্যতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক ভ্রাজিষ্ণু। তার প্রতি রইল আমার অনেক আশা।

—সঞ্জয় ব্যানার্জী,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

আবাস যোজনার দুর্নীতি

কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে যতগুলো জনমুখী প্রকল্প আছে তার মধ্যে অন্যতম একটি প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের গরিব মানুষের যত মাটির বাড়ি আছে সেগুলিকে পাকা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র এই প্রকল্পের ৬০ শতাংশ এবং রাজ্য ৪০ শতাংশ অর্থ মঞ্জুর করে। রাজ্যের প্রশাসনের হাত ধরেই এই প্রকল্পের জন্য উপভোক্তা সনাক্তকরণ এবং তাদের সমস্ত ডকুমেন্টস পরীক্ষা করা হয়। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটের ও লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে মাটির বাড়িগুলোর সার্ভে হয়েছিল। তারপর নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের নাম ভাঁড়িয়ে রাজ্যে অন্য নামে চালাচ্ছিল বলে বিরোধীদের অভিযোগ। প্রকল্পের নাম নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে দড়ি টানাটানি ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি কম হয়নি। বেশ কিছুদিন ধরে এই প্রকল্পের অর্থ কেন্দ্র সরকার বরাদ্দ করেছে। কিন্তু রাজ্যে বাড়ি প্রাপকদের তালিকা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ প্রতিদিন উঠছে। বেশিরভাগ জায়গায় আসল উপভোক্তাদের নাম নেই। তার পরিবর্তে শাসক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, ছেলে, বউদের নাম রয়েছে। সেক্ষেত্রে তারা একতলা, দোতলা বাড়ির মালিক হলেও ক্ষতি নেই।

আসলে এই সরকারি প্রকল্পের টাকা গরিব মানুষকে বঞ্চিত করে পকেটস্থ করার জন্য শাসকদলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। কিছুদিন আগেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা-১নং ব্লকের সন্ধিপুর অঞ্চলে আসল উপভোক্তাদের বদলে অন্যদের অ্যাকাউন্টে আবাস যোজনার টাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে বিডিও সাহেবের অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়ে জেল খাটছেন। তাই এবার শাসক দল একটু সাবধান হয়ে তারা আশা, আইসিডিএস কর্মীদের ময়দানে নামিয়েছে কিন্তু পঞ্চায়েত অফিসে যখন লিস্ট ফাইনাল হচ্ছে তখন শাসক দলের প্রধান ও নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে কাজ হচ্ছে। তাই প্রকৃত গরিব মানুষ অনেক জায়গায় বঞ্চিত থেকেই যাচ্ছেন। সরকারি আধিকারিকেরা যদি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হতো তবে

তারা সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে বৈঠক করতেন। কোথায় আসল উপভোক্তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে সেগুলো খুঁজে বের করতেন। শুধুমাত্র তার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য, শাসক দলকে এবার হয়তো ভোটটা দেয়নি তাই তারা আবাস যোজনার তালিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাই রাজ্যজুড়ে আবাস যোজনার দুর্নীতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।

কয়লা, বালি, কাঠ, পাথর ও চাকরি চুরির ঘটনা রাজ্যের মানুষ দেখেছেন, এবার গরিব মানুষের বসবাসের ছাদটিও চুরি হয়ে যাচ্ছে। সেই গরিব মানুষের ছাদ চুরি করে নেতা-মন্ত্রীদের ভাইপো, ভাইঝি, মামা, দাদাদের বাড়ি অট্টালিকার রূপ পাচ্ছে। এই রাজ্যের গরিব মানুষ কেন তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। স্বাধীনতা সত্তর বছর পরেও কেন তারা ভগ্ন কুঁড়েঘরে বসবাস করবেন। প্রশাসন কেন সক্রিয়, সদর্থক ভূমিকা নেবে না আসল গরিব মানুষের মাথার উপর পাকা ছাদ তৈরি করে দিতে?

এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বর্তমানের বাজার মূল্য অনুযায়ী খুবই কম। মাত্র ১২০-১৫০ হাজার টাকায় পাকা ছাদ তৈরি করা খুব মুশকিল। তাই রাজ্যের ও কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের জন্যে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হোক। প্রকৃত উপভোক্তাদের এই প্রকল্পের জন্যে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা হোক। অনেক প্রকল্পের মতো এই জনপ্রিয় প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য প্রশাসন স্বচ্ছভাবে গরিব মানুষের হাতে অর্থ তুলে দিক। গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষ রাজনৈতিক দলাদলির শিকার হচ্ছেন। তারা শাসক ও বিরোধী দলের রাজনীতির মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন। তাদের সবাই প্রলোভন দেখায় কিন্তু তারা কেউ তাদের অধিকার সুরক্ষিত করছেন না। তাই গরিব লোকদের ছাদ চুরি বন্ধ হোক। আসল উপভোক্তাদের বঞ্চিত না করে প্রশাসন নিজের দায়িত্বে প্রকৃত উপভোক্তাদের আবাস যোজনার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করুক।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

স্কুলে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ্য বিষয় হওয়া কেন প্রয়োজন?

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অস্বাভাবিক আচরণ সততই লক্ষ্য করা যায় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান অসামাজিক ও আগ্রাসী আচরণের উৎস, কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের ব্যবস্থা নেওয়া নিসন্দেহে প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পঠনপাঠনের সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে একটি বাংলাবই প্রকাশের প্রয়োজন। ইংরেজি ভাষায় এই বিষয়ে অনেক বই আছে, কিন্তু বাংলাভাষায় নেই।

অতি সম্প্রতি বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হয়ে গেল, কিন্তু তার শেষের রেশ বড়ো মর্মান্তিক। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, সংবাদপত্রে প্রকাশ, বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্বাসের লেখা 'বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে ব্রাসেলসে দাঙ্গা। প্যারিসে ভাঙচুর, লুটতরাজ। বাংলাদেশে উন্মাদনায় ১২ জনের মৃত্যু। এই খবরগুলো আমাদের স্বভাবের হিংস্রতাকে এমন নগ্ন করে আর নির্বোধ ভাবে প্রকাশ করে যে মানুষ লজ্জা পেতে বাধ্য। স্রেফ একটা ফুটবল ম্যাচ, তা নিয়ে নাচনকোঁদন ঠিক আছে, তা বলে দাঙ্গাফ্যাসাদ করে খুন!' বাংলাদেশে ১২ জনের মৃত্যু, তার বেশিরভাগই কিশোর ও তরুণ। ভারতেও কিছু কিছু স্থানে বিশৃঙ্খলা দেখা গেছে। প্রশ্ন হলো, এমনটা হয় কেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সদেকা হালিমকে উদ্ধৃত করে প্রথম আলো লিখেছে, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, সহমর্মিতা কমে যাওয়ায় এখন খেলার সমর্থনের মতো তুচ্ছ বিষয়ে মানুষ মারামারিতে জড়িয়ে পড়ছে। আলোচনা প্রেক্ষিতে আমি একজন প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে বলছি— ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা এই তিনটি মানবীয় গুণের অভাবে শুধু তরুণ ও কিশোর নয়, বর্তমান মানব সভ্যতার প্রগতিশীল বিশ্বে নারীধর্ষণ, শিশুকন্যা ধর্ষণ, ধর্ষণ করে হত্যা, এমনকী রাজনৈতিক হিংসায়ও নারীধর্ষণ— এসব অমানবিক ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড ঘটে চলছে।

আমরা যদি অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে দেখবো ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা— এই তিনটি গুণের অভাবই এর কারণ। যে শিক্ষা মানুষের মানবীয় গুণের বিকাশ ঘটায় সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় কতটা ত্রুটি রয়েছে অথবা সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয় কতটা প্রভাবশালী, সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদী বলতে পারি। তিনি উপনিষদীয় দর্শনে প্রভাবিত। তাঁর ধারণা ছিল সৃষ্টির মূলে আছে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি। তাঁর গানে— 'সীমার মাঝে, অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এতো মধুর।' এখানে তিনি সীমা বলতে নিজের দেহকেই বুঝিয়েছেন। উপনিষদীয় মূল দর্শন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' শ্রীমদ্ভগবত গীতার ১৪নং অধ্যায়ের ৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে— 'সর্বযোনিষু কৌন্তেয়ঃ মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীযপ্রদঃপিতা।।' রবীন্দ্রনাথের দর্শনের মূল স্বরূপও এটাই। স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদ ও বেদান্তের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এ পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করেছেন। তিনি ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার দুটি রূপেরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমরা পূজা করি অর্থাৎ সাকার মৃন্ময় প্রতিমার মধ্যে চিন্ময় নিরাকারের আরাধনা করি। ব্রহ্মের সাকার রূপ ধারণ ছাড়া কর্মময় পৃথিবীতে কাজ করার আবশ্যকতা সৃষ্টি হতো না। শ্রীমদ্ভগবত গীতায় ১০ম অধ্যায়ের ২০নং শ্লোকে বলা হয়েছে— 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতয়শয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামান্ত এব চ।।' এটা প্রমাণ করে মানুষে মানুষে সমভাব, সমদর্শন ও অহিংসাই সনাতন দর্শন। অর্থাৎ আমিই সর্বভূতে অবস্থান করছি। তাই কিশোর, তরুণ শুধু নয়, সকলেরই ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা আনায়নে ভারতে শ্রীমদ্ভগবত গীতা বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় হওয়া প্রয়োজন।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
শিয়ালদহ, রাশিডাঙ্গা-২, কোচবিহার।

দুঃখের দিন পিছনে ফেলে
আশা এখন সিভিল সার্ভিস অফিসার

দিতি ভট্টাচার্য্য

‘আমি একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে সমাজে ন্যায়বিচার আনতে কাজ করতে চাই। আমার প্রচেষ্টা শুধু আমার সম্প্রদায়ের জন্য নয়, প্রতিটি অন্যায়ের জন্য।’

‘বিয়ে ভাঙ্গা, জাতিগত বৈষম্য, লিঙ্গ পক্ষপাত— আমাকে অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু আমি কখনই নিজেকে দুঃখে ডুবতে দিইনি এবং পরিবর্তে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি মানুষ যদি আপনাকে পাথর ছোড়ে, তবে আপনার সেই পাথর জড়ো করা উচিত এবং তা দিয়ে একটি সেতু নির্মাণ করা উচিত।’

‘মানুষ কী বলবে ভেবে জীবন যাপন করলে কিছু করতে পারবেন না। আপনি আপনার স্বপ্নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন এবং সেই সংগ্রামী পথে হাঁটুন।’ যদি কিছু করার দৃঢ় সংকল্প থাকে এবং কঠোর পরিশ্রম করার জন্য প্রস্তুত থাকা যায় তবে সবচেয়ে কঠিন যাত্রাও সহজেই সম্পন্ন করার যায়। যোধপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্যানিটেশন কর্মী আশা কান্দারারও একই রকম অনুপ্রেরণাদায়ক গল্প রয়েছে। আশা দুই সন্তানের মা। তাঁর সাফল্য ব্যাপকভাবে আলোচিত।

৪০ বছর বয়সি যোধপুর নিবাসী আশা কান্দারা। তিনি ১৯৯৭ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু ২০০২ সালে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের ট্রমা কাটিয়ে উঠতে তাঁর দীর্ঘ সময় লেগেছিল এবং তারপরে তিনি প্রথাগত শিক্ষা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। স্কুল স্তর থেকে শুরু করে, ২০১৬ সালে স্নাতক হন তিনি। এর পরে তিনি রাজস্থান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের পড়াশোনায় যুক্ত হন এবং ২০১৮ সালে তিনি তার প্রাথমিক পীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এদিকে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য যোধপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ঝাড়ুদারের চাকরির জন্য আবেদন করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঝাড়ুদারের কাজ শুরু করেন। তাঁকে জীবনধারণের জন্য দু’ বছর যোধপুরের রাস্তায় ঝাড়ু দিয়ে জীবিকানির্বাহ করতে হয়। কাজ করার সময়, আশা মেইনসের জন্য তার পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং ২০১৯ সালে পরীক্ষা দেন। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে এই পরীক্ষার ফলাফলও অন্যান্য বিষয়ের মতো বিলম্বিত হয়েছে। অবশেষে দীর্ঘ তিন বছরের অপেক্ষার পর ২০২১ সালের জুলাই মাসে ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং তিনি সফল হন।

বিয়ের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে আশার বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তিনি তার দুই সন্তানকে একা হাতে লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর বাবা মা এবং সন্তানদের লালন পালন করার জন্য ঝাড়ুদারের চাকরি করতে শুরু করেন। আশাদেবী একটি অসম যাত্রা শুরু করেছিলেন, যেখানে তাকে তার জাতপাতের জন্য, তার চাকরির জন্য এবং একজন বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা হওয়ার জন্য তাকে অপমানিত হতে হয়েছিল। ‘এ সবই আমাকে শক্তি দিয়েছে যে আমাকে জীবনে কিছু হতে হবে এবং সমাজকে একটি উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। এবং এটি কেবল শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে’, বলেছেন আশাদেবী।

তাঁর অনুপ্রেরণা তাঁর বাবা, রাজেন্দ্র কান্দারা যিনি ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার একজন অবসরপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক। তিনি সর্বদা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার এবং তার সন্তানদের নিজের মতো করে বড়ো করার স্বপ্ন দেখতেন। আশার মতে, পরীক্ষা দেওয়ার পরে, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি অবশ্যই নির্বাচিত হবেন। অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আরএএস-এ নির্বাচিত হন আশা কান্দারা। তিনি আরএএস পরীক্ষা ২০১৮-তে ৭২৮তম স্থান পেয়েছিলেন। তার সাফল্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। যোধপুর কর্পোরেশনের মেয়র এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মনের মধ্যে যদি কিছু করার ইচ্ছা থাকে এবং পরিশ্রম করার ইচ্ছা থাকে তবে খুব কঠিন যাত্রাও সহজে সম্পন্ন করা যায়। ঝাঁটা হাতে যোধপুরের রাস্তা সাফ করা মহিলাই আজ সিভিল সার্ভিস অফিসার!

এই সম্মাননীয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহিলার জীবন কাহিনি যেমন আমাদের অনুপ্রেরণা দেয় তেমন এটাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় আমাদের সমাজকে এখনও সমস্ত ধরনের মানুষকে বিশেষ করে নারীর সম্মান ও তাকে সঠিকভাবে সসম্মানে গ্রহণ করার জন্য দীর্ঘ উত্তরণের পথ পাড়ি দিতে হবে। □

‘অঙ্গনা’ বিভাগের জন্য লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। বিষয় : নারী ক্ষমতায়ন, বর্তমান ভারতে নারী সমাজের অগ্রগতি, দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মাতৃশক্তি, নারী শক্তির উত্তরণের কাহিনি, রত্নগর্ভা মা ইত্যাদি নারী জাগরণের যে কোনও দিক। যা ভারতীয় নারী সমাজের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে সক্ষম।
ওয়ার্ড ফাইল অথবা পিডিএফ পাঠাতে পারেন। হাতে লেখা কপি স্ক্যান করে পাঠাবেন।

যোগাযোগ-স্বস্তিকা সম্পাদকীয় বিভাগ,
মোবাইল-৮৪২০২৪০৫৮৪

বিঃ দ্রঃ- অঙ্গনা বিভাগে শুধুমাত্র মহিলা লেখকদেরই লেখা প্রকাশিত হয়।

শীতে সুস্থ থাকতে হলে শরীরের বাড়তি যত্ন নেওয়া আবশ্যক

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

শীত চলছে। সন্দেহ নেই শীতে বিভিন্ন অসুখের প্রকোপ বাড়ে। তার মধ্যে অ্যাজমা, চর্মরোগ ও নাক-কান-গলার অসুখও দেখা দেয়। ফলে এই সময়টায় বাড়তি যত্ন নেওয়া উচিত। জেনে নেওয়া যাক, শীতকালে উল্লেখিত রোগ থেকে শুস্থ থাকতে কী করণীয় :

অ্যাজমা : হাঁপানি বা অ্যাজমাজনিত শ্বাসকষ্টের রোগ কেবল শীতকালীন রোগ নয়। কিন্তু শীতের প্রকোপে অনেকাংশে বেড়ে যায়। অ্যাজমা একবার হলে এই রোগের ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হয় সারা জীবন। তবে অ্যাজমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে জটিলতা বা ঝুঁকি থাকে না বললেই চলে। এই রোগের সমস্যা নিরসনে শীতে পর্যাপ্ত গরম জামাকাপড়ের বন্দোবস্ত থাকতে হবে। ঘরে পর্যাপ্ত আলো- বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিশেষ করে শোবার ঘরটি উষ্ণ রাখা জরুরি। তাছাড়া অ্যাজমার ট্রিগারগুলো জেনে সতর্কভাবে চলতে হবে। শীতের আগেই চিকিৎসককে দেখিয়ে ইনহেলার কিংবা অন্যান্য ওষুধের ডোজ সমন্বয় করে নিতে হবে।

চর্মরোগ : শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে। শুষ্ক বাতাস ত্বক থেকে শুষে নেয় জল। ফলে ত্বক হয়ে পড়ে দুর্বল। ত্বকের ঘর্মগ্রন্থি ও তৈলগ্রন্থি ঠিকমতো ঘাম বা তৈলাক্ত পদার্থ তৈরি করতে পারে না। এতে ত্বক আস্তে আস্তে আরও শুষ্ক, ফাটল ধরে ও দুর্বল হয়। একসময় ত্বক ফেটে যায়।

এর থেকে পরিত্রাণ পেতে যা করতে হবে— অলিভ অয়েল ত্বকে আলাদা আস্তরণ তৈরি করে বলে ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। শীতের সময় তাই অলিভ অয়েল বা লুব্রিকেন্ট জাতীয় কিছু ব্যবহার করা ভালো।

খুশকি দূর করতে অন্য সময়ের চেয়ে শীতে বেশি করে চুল শ্যাম্পু করা উচিত। হাত ও পায়ের তালু ও ঠোঁটে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করা দরকার। ত্বকের সুরক্ষায় ময়েশ্চারাইজার যেমন— ভ্যাসিলিন, গ্লিসারিন, অলিভ অয়েল ও সরষের তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু বেশিক্ষণ রোদে থাকা বা কড়া আগুনে তাপ পোহানো উচিত নয়। কারণ এতে চামড়ার সমস্যা তৈরি হতে পারে।

নাক-কান-গলার অসুস্থতা : এসব সমস্যাও শীতে বাড়ে। বৃদ্ধ থেকে শুরু করে এসব রোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় নবজাতক, শিশু ও ধূমপায়ীদের।

শীতকালে নাকের দুই পাশের সাইনাসে ইনফেকশন দেখা দেয়। আর একে বলে সাইনোটাইসিস। কারও সাইনোটাইসিস দেখা দিলে নাকের দুই পাশে ব্যথা ও মাথাব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অ্যালার্জি, ঠাণ্ডা ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সমস্যাগুলো থেকে এই রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। কারও যদি অ্যালার্জি থাকে, সেক্ষেত্রে জেনে নিতে হবে অ্যালার্জির কারণ। যাতে সতর্ক হয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পাশাপাশি ধূমায়িত ও দূষিত পরিবেশ পরিত্যাগ করে চলা, ধূমপান বর্জন করা, ঘুমানোর সময় মাথা উঁচু রাখা (যাতে সাইনাস নিজে থেকে পরিষ্কার হতে পারে), নাকে খুব জোরে আঘাত লাগতে না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখা আবশ্যক।

যাঁদের গলা ব্যথা, স্বরভঙ্গ, কণ্ঠনালির নানা সমস্যা-সহ টনসিলের প্রদাহ কিংবা টনসিলাইটিস রয়েছে, তাঁরা নুন নেশানো হালকা গরম জল দিয়ে গারগ্‌ল করলে আরাম পাবেন। ঠাণ্ডা জল পরিহার করে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করা-সহ গলায় গরম কাপড় বা মাফলার জড়িয়ে রাখলে ফল পাওয়া যাবে।

উপরে উল্লেখিত সমস্ত সমস্যার সমাধান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে সম্ভব। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সাইড এফেক্ট কম। □

টাকার নোট বাতিল তো হয়েছিল ভারতে, কিন্তু দেউলিয়া হতে বসেছিল পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই (ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স)। তাও মাত্র চার ঘণ্টায়!

শুধু তাই নয়, ওই চার ঘণ্টাতেই মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্ট, ড্রাগ কিংপিন ও মাফিয়া গ্যাংস্টার দাউদ ইব্রাহিমের সিন্দুকে তালা পড়লো, জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবা'র ভারতে চলা নেটওয়ার্কগুলোর টাকা সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল, তাদের মাথা হাফিজ সাইদের ব্যবসা লাটে ওঠার জোগাড় হলো, আর ১২ লক্ষ কোটি টাকা ডুবে গেল পাকিস্তানের।

নোটবন্দিতে শেষ সমান্তরাল অর্থনীতি

নিখিল চিত্রকর

৮ নভেম্বর, ২০১৬। রাত ৮ টা। জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেদিন যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অসাধু ব্যবসায়ীদের মনে হঠাৎ আশঙ্কার ঝড় তুলে দিয়েছিলেন তা এযাবৎ ভারতের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। সেই ভিডিয়োবার্তায় ঘোষণা করা একটি সিদ্ধান্তে দেশের কালোবাজারিরা যেভাবে হাজার ভোল্টের শক খেয়েছিল তার রেশ চলছে এখনও। এমনকী তার অভিঘাত সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল চীন-পাকিস্তানেও। সেদিন দুর্নীতি, কালো টাকা, দেশের মধ্যে চলা সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা এবং সন্ত্রাসবাদের কোমর ভাঙতে মোক্ষম দাওয়াই হিসেবে ভারত সরকার 'ডিমনিটাইজেশন' বা বহু আলোচিত 'নোটবন্দি' ঘোষণা করেছিল। মজার কথা, সেই রাতে ৫০০ ও ১০০০ এতসব বিপর্যয়ের মূলে ছিল—ভারতের নোটবন্দির সিদ্ধান্ত। যার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় ব্ল্যাকমানি ও টেরর ফান্ডিঙের বিরুদ্ধে অন্যতম সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে ভারতের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এসেছে। ২০১৬-র জানুয়ারিতে ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং এনআইএ-র একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ভারতীয় ৫০০ ও ১০০০ টাকার

নোটের টেম্পলেট হাতিয়ে নিয়ে লাহোরের সরকারি প্রিন্টিং প্রেস, এবং পোশোয়ার ও কোয়েটার প্রেসে জালনোট ছাপছে। সব মিলিয়ে ১২ লক্ষ কোটি টাকার নকল ভারতীয় নোট ভারতের বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তান। সেই টাকার মাধ্যমে সারা দেশে ফেক কারেন্সি নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিয়ে রাতারাতি মালামাল হয়ে উঠেছিল আইএসআই। লক্ষ্য ছিল ভারতের অর্থব্যবস্থাকে পুরোপুরি পঙ্গু করে দেওয়া। ১৬ নভেম্বর ডিমনিটাইটেজেশনের একটা ঘোষণায় সমস্ত ষড়যন্ত্রে জল ঢেলে দেয় ভারত সরকার। সমস্ত জালনোট বদলে গেল মূল্যহীন কাগজে। এই বিপর্যয়ের আভাস ৭ টা ৫৯ মিনিটেও আঁচ করতে পারেনি কাঁটাতারের ওপারে থাকা সন্ত্রাস মদতপুষ্ট পাকিস্তান।

একসময় কারেন্সি ছাপার বিশেষ কাগজ ভারতে আসতো জাপান ও অস্ট্রেলিয়া থেকে। কংগ্রেস আমলে অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন পি চিদম্বরম ব্রিটিশ ব্যাংকনোট কোম্পানি লন্ডনের 'ডে লা রু' (De La Rue)-- কোম্পানিকে এই কাগজ সাপ্লাইয়ের বরাত দেন। পরবর্তীকালে গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারে ওই একই সংস্থা পাকিস্তানকেও কারেন্সি নোটের কাগজ রপ্তানি করে থাকে। ফলে ভারতের নোট নকল করা পাকিস্তানের কাছে খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। সঙ্গে দোসর ছিল শি জিন পিং-এর চীন। একাজে পাকিস্তানকে তাদের প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ড্রাগনের মুলুক। এই জন্যই ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে সম্পূর্ণ দেশীয় ব্যবস্থায় নোট ছাপার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। দেশীয় প্রযুক্তিতেই ফ্লুরোসেন্ট কালি, বিশেষ কাগজ তৈরির কথা বলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল, ''ভারত এখন থেকে আমদানি কমিয়ে দেশেই বেশিরভাগ পণ্য উৎপাদনে জোর দিচ্ছে। সেই নিরিখে ভারতীয় কারেন্সিও মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের আওতায় তৈরি হওয়া উচিত। এ বিষয়ে তিনি দেশের শিল্পপতিদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

নোটবন্দির বিশাল ধাক্কায় পাকিস্তানের মতোই ছন্নছাড়া দশা হয়েছিল এদেশের কালোবাজারিদের। দুর্নীতিগ্রস্ত মুষ্টিমেয় নেতা-মন্ত্রী, ব্যবসায়ীদের ফল্‌স সিলিং, স্টোর রুম, বাথরুম, লফ্‌ট-সহ বিভিন্ন চোরা কুঠুরিতে বস্তা বস্তা নগদ টাকা বোঝাই করা ছিল তা এক লপ্তে মূল্যহীন হয়ে পড়ে রইল। এরাই আবার প্রকাশ্যে বড়ো বড়ো সমালোচক হয়ে উঠলো নরেন্দ্র মোদীর নোটবন্দির সিদ্ধান্তের। ভাবটা এমন, 'রান্না ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি!' ভারত সরকারের যে সিদ্ধান্তে রাতারাতি আইএসআই মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনের নেটওয়ার্ক ধূলিসাৎ হয়ে গেল, ভারতের বিপন্নপ্রায় অর্থনীতি নতুন করে অক্সিজেন পেল; দুর্ভাগ্যের বিষয়, নরেন্দ্র মোদী সরকারের সেই ডিমনিটাইজেশনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ৫৮ টি পিটিশন দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে বিচারপতিদের সাংবিধানিক বেঞ্চকে আবার রায় দিয়ে নোটবন্দির বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে!

নোটবন্দির প্রতিবাদে বিরোধীদের জমায়েত।

ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই আমাদের

দেশ। এখানে বিরোধী পক্ষ সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তের নিন্দে করে। এরাই এতদিন কাশ্মীরে জঙ্গিদের মৃতদেহ সসম্মানে মিছিল করে বয়ে নিয়ে যেত। কিছু পেটোয়া বাজারি পত্রিকা আবার সেইসব জঙ্গির জানাজা'র ছবি কাগজের প্রথম পাতায় ছেপে জঙ্গির মৃত্যুকে মহিমান্বিত করতো। যেমনটা করা হয়েছিল হিজবুল মুজাহিদিন কমান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুতে। অথচ গত পাঁচ বছরে এ দেশ থেকে মাওবাদী কার্যকলাপ যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করে না কেউ।

ভারতের কাছে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুর্নীতি। সামাজিক সিস্টেমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বাড়ি-জমি কেনা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা সর্বত্র নগদ লেন-দেনের সুলভ পরিসরে দুর্নীতিরই বাড়বাড়ন্ত। দুর্নীতির আড়ালে দেশের অর্থনীতিতে থাবা বসায় কালোবাজার। বেনামি সম্পত্তি, অঘোষিত সম্পদ, নির্বাচনে কালোটাকার রমরমা--- সবমিলিয়ে ভারতে একটা সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা চলছিল। যা ছিল রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ২০০১ সালে ভারতের সংসদ ভবনের বাইরে জঙ্গিদের গুলি চালানোর ঘটনা এবং ২০০৮ সালে ২৬ নভেম্বর মুম্বাইয়ে জঙ্গি হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্রের কেনাকাটায় হাওয়ালা যোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করত দাউদ ইব্রাহিম, হাফিজ সাইদ ও পাকিস্তান সরকারের মিলিত চক্র। আইএসআইয়ের ছাপা ৫০০ ও ১০০০ টাকার জালনোট এত বেশিমাত্রায় ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল যে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল রিজার্ভ ব্যাংকের মোট কয়েন ও নোটের ৮০-৯০ শতাংশ। তলানিতে এসে ঠেকেছিল দেশের ব্যাংকিং লেন-দেন। অত্যধিক হারে নগদ লেন-দেনে দেশের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। যার প্রভাব সরাসরি পড়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর।

তাই সমান্তরাল অর্থনীতির উৎসমুখ ক্লোজড্ করে ভারতকে চাঙ্গা করতে প্রয়োজন ছিল দুর্নীতিমুক্ত ফর্ম্যাল ইকোনমি। সেই পথেই হেঁটেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। ভারতের অর্থনীতিকে কণ্টকমুক্ত করতে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করা হয়েছিল মাঝরাত থেকে। যা নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তেড়েফুঁড়ে বিরোধিতা করেছিল। মিডিয়াতে তারা সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ফলাও করে বলে বলে এন্তার ঢাকঢোল পিটিয়ে যাচ্ছিল। বাংলায় একটা চলতি প্রবাদ আছে, "পড়লো কথা হাটের মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।" বিরোধীদের ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক উপমা। সাধারণ মানুষের সমস্যার আড়ালে নিজেদের দীর্ঘশ্বাসও ব্যক্ত করে ফেলেছিল তারা। এক স্বনামধন্য মুখ্যমন্ত্রী তো নকুলদানা পর্যন্ত কিনতে পারেননি টাকা নেই বলে। পাড়ার দোকানদার তাঁকে ধারে দিয়েছিল বলে নিউজ চ্যানেলের পরদায় চিৎকার করছিলেন তিনি। নোটবন্দির ফলে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থমকে যাবে বলে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। তাঁরা হয়তো জানতেন না ট্রেন যখন লাইন পরিবর্তন করে তখন তাকেও গতি মন্থর করতে হয়। সেটাও সাময়িক। তাই বলে ট্রেন থমকে দাঁড়ায় না। ড. মনমোহন সিংহের আমলেও আর্থিক সংস্কার হয়েছিল। সে সময় ২ শতাংশে জিডিপি নেমেছিল। তারপর ভারতের অর্থনীতি আবার নিজস্ব গতি ধরে ফেলে। নোটবন্দির ৬ বছর পর নরেন্দ্র মোদীর জমানায় ভারতের অর্থনীতি ব্রিটেনকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে দৌড়চ্ছে।

অথচ নরেন্দ্র মোদীর অতি বড়ো সমালোচকও জানেন, যে বিষয়ে তিনি বা

এক নজরে

১) ২০১৬ সালে বাতিল ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের ৯৯ শতাংশ ফেরত এসেছে ব্যাংকে।

২) ৮৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা অনথিভুক্ত আয়ের কথাও প্রকাশ্যে এসেছে।

৩) নোটবন্দির সময় ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের মোট মূল্য ছিল ১৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। যার ৮৬ শতাংশ বাতিল করা হয়।

৪) নোটবন্দির আগে ভারতে নগদ ১৭.৫ লক্ষ কোটি টাকা বাজারে ছিল, ২০২০ সালে সেই পরিমাণ কমে হয় প্রায় ২৯ লক্ষ কোটি টাকা। যদি নোটবন্দি না হতো তাহলে আজ ভারতে ক্যাশ সার্কুলেশন দাঁড়াতো ৩২.৫ লক্ষ কোটি টাকা। এমন হলে ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হতো।

তাঁর পরিষদীয় মন্ত্রীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন, বেশ কিছুদিন ধরে বারবার কথা বলেন; তা নিয়ে তিনি পদক্ষেপ করবেনই। নোটবন্দির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, এনআইএ-র বিভিন্ন গোপন রিপোর্ট দেখে বিশেষজ্ঞ কমিটির সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হয়। দেশের অসাধু ব্যবসায়ী, অবৈধভাবে কালোটাকা মজুতকারীদেরও বার্তা দেওয়া হয়। সরকারিভাবে ঘোষণা পর্যন্ত করা হয়—''যাদের এই ধরনের অঘোষিত টাকা মজুত আছে, যারা বেনামি সম্পত্তি গচ্ছিত রেখেছেন বিভিন্নভাবে; তাঁরা সেসব ব্যাংকে জমা করুন। যাবতীয় সম্পত্তির ডিক্লেয়ারেশন দিন, সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে সমস্ত কালো সম্পদ বৈধ করান।'' হ্যাঁ, এর জন্য কিছু পেনাল্টি হয়তো দিতে হতো। সরকারের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও কেউ সোজা পথে যেতে চাননি। অনেকেই ভেবেছিল, নরেন্দ্র মোদীও তাঁর পূর্বসুরীদের মতো ঘোষণাতেই আটকে থাকবেন হয়তো। সরকারের অনেক কাজ। একসময় তারা ভুলেও যাবে। কিন্তু ব্যক্তির নাম যখন নরেন্দ্র মোদী, তখন অনেকের সমস্ত হিসেব গরমিল করে ফেলতে পারেন তিনি। অবশেষে রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে একটানা ৬ মাসের আলোচনার পর নির্দিষ্ট প্ল্যানিঙের ভিত্তিতে বাতিল করা হয় ৫০০ ও ১০০ টাকার নোট। এদশের আর্থিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ওই দুটি নোট বাদ দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। পরিবর্তে বাজারে নতুন ৫০০ টাকার নোট ও ২০০০ টাকার নোট নিয়ে এলো ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। শুধু তাই নয়, সরকারি উদ্যোগে দেশের জনসাধারণকে ইউপিআই পেমেন্টের মতো অনলাইন লেন-দেনে উৎসাহ দেওয়া হলো। ২০১৬-র পর থেকে আজ পর্যন্ত সারাদেশে ৫৯ শতাংশ মানুষ অনলাইনে লেন-দেন করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরের নরঘাটের পথের ধারে বসে ডাব ডাব করা মানুষটিও এখন সঙ্গে পেমেন্ট অ্যাপের কিউআর কোড রাখেন। এর ফলে খোলাবাজারে কারেন্সি সার্কুলেশন কমেছে। যা ইঙ্গিত করে দেশে নতুন করে কালোটাকা মজুত হচ্ছে না। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলেন বাজারে কারেন্সি সার্কুলেশন সব সময় দেশের জিডিপি'র কম থাকা উচিত।

নোটবন্দির পর যেসব তথ্য সামনে আনা হয়েছে তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। পাকিস্তান চীনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নিজেদের সরকারি ছাপাখানায় যে ভারতীয় জালনোট ছাপত তা দেখে তাজ্জব হয়েছিলেন এনআইএ কর্তারা। হুবহু একই রকম সেই নোট দেখে চট করে বোঝার উপায় ছিল না যে সেটা নকল। এই জালনোট বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে ভারতে পাঠাতো পাকিস্তানিরা। মূলত তিনটি নির্ধারিত রুট ব্যবহার করতো তারা। এই জালনোটের কারবারে বড়ো চাঁই ছিল দাউদ, হাফিজ সাইদ এবং আইএসআই। প্রথম রুট ছিল পশ্চিমবঙ্গের মালদা। কলকাতা থেকে ৩২৭ কিলোমিটার দূরের মালদা জেলার লাগোয়া বাংলাদেশ ও নেপাল। এই রুট নিয়ন্ত্রণ করতো আইএসআই। ভারতে সবচেয়ে বেশি জালনোট ঢুকতো মালদা হয়ে। আইএসআই-এর কাছে মালদা ছিল সবচেয়ে 'সেফ রুট'। বাংলাদেশ থেকে মালদায় খুব সহজেই জালনোট ডাম্প করতে পারত আইএসআই। মালদা থেকে ২০১১-২০১৬ পাঁচ বছরে ১৪৭ জন হ্যান্ডলার ধরা পড়ে এনআইএ-র জালে। এছাড়াও একটা বড়ো অংশের টাকা ঢুকতো চীন হয়ে নেপাল সীমান্তে। সেখান থেকে মালদায়। হাফিজ সাইদ জম্মু রুট ব্যবহার করে ভারতে জালনোটের নেটওয়ার্ক খুলে বসেছিল। আর দাউদ ইব্রাহিম ব্যবহার করত দুবাই রুট। বলাবাহুল্য, নোটবন্দির পর সমস্ত রুটেই এখন তালা পড়েছে।

ডিমনিটাইজেশনের পাঁচবছর পর ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করে দেখা গেছে, আগের তুলনায় বেশি সংখ্যক ভারতবাসী ট্যাক্স দিচ্ছে। একটা সময় ট্যাক্স না দেওয়ার যে বেপরোয়া মনোভাব দেখা যেত, তার প্রবণতা অনেক কমেছে। কর ফাঁকি দিলে তার শাস্তি পাওয়ার ভয়েও মানুষ সময় থাকতে কর দিচ্ছে। নোটবন্দির পর করফাঁকির সাজা আগের তুলনায় ৬ গুণ বাড়িয়েছে মোদী সরকার। দেশে ডিজিটাল লেন-দেনের পরিকাঠামো শক্তপোক্ত ভাবে তৈরি হয়ে গেছে। ২০২১ সালে শুধুমাত্র অক্টোবর মাসেই সারা দেশে ৭.৫ লক্ষ টাকার ইউপিআই পেমেন্ট করা হয়েছিল। এই পরিসংখ্যান দিয়েছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। দেশে জালনোটের সার্কুলেশন ক্রমশ কমেছে। রিজার্ভ ব্যাংকের একটি তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে ৭.৫ লক্ষ জাল নোট বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ২০২০-তে এসে বাজেয়াপ্ত জালনোটের সংখ্যা নেমে আসে ২ লক্ষ'র ঘরে। তাছাড়া দেশজুড়ে চলা সমান্তরাল অর্থনীতিও প্রতিরোধ করা গেছে অনেকখানি। আজ ভারতের অর্থনীতি যেভাবে নানারকম চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তাতে নিঃসন্দেহে ডিমনিটাইজেশন অথবা নোটবন্দির বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

যে পথে ঢুকতো জালনোট

১) বাংলাদেশ হয়ে মালদা সীমান্তে জালনোটের বান্ডিল ফেলে দিত আইএসআই। এজেন্টরা এসে গ্রামবাসীদের টাকার লোভ দেখিয়ে জালনোট সংগ্রহ করে ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করানো হত। জালনোটের বড়ো অংশ আসত চীনের পথে নেপাল হয়ে মালদায়।

২) জম্মু রুটের মাধ্যমে ভারতে জালনোট ডাম্প করত লস্কর-এ-তৈবা'র চাঁই হাফিজ সাইদ।

৩) দুবাই রুটের মাধ্যমে ভারতে জালনোট পাচার করত ড্রাগ মাফিয়া দাউদ ইব্রাহিম।

ভারতে আগেও হয়েছে নোটবন্দি—

১) ১৯৪৬ সালে প্রথমবার ১ হাজার বা তার বেশি টাকার নোট বাতিল হয়েছিল ভারতে।

২) দ্বিতীয়বার নোট বাতিল হয় ৩২ বছর পর ১৯৭৮ সালে।

৩) ভারতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ১০ হাজার টাকার নোট ছাপা হয়েছে।

৪) ১৯৩৮ সালে সবচেয়ে প্রথম ১০ হাজার টাকার নোট ছাপা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে তা বাতিল পুনরায় ১৯৫৪ সালে তার পুনর্মুদ্রণ হয়। ১৯৭৮ সালে পাকাপাকিভাবে ১০ হাজার টাকার নোট বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। □

চেন্নাইয়ে ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান

কলকাতার প্রখ্যাত সামাজিক-সাহিত্যিক সংস্থা শ্রীবড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ২৫ ডিসেম্বর ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় চেন্নাইস্থিত সুরানা অ্যান্ড সুরানা সভাগারে। এবারের ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান প্রদান করা হয় প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রী কেশব পরাশরণজীকে, যিনি শ্রীরামজন্মভূমি মামলায় রামলালার পক্ষের উকিল ছিলেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী বলেন, রামভক্তি ও রাষ্ট্রভক্তির মণিকাঞ্চন যোগ হলেন শ্রী পরাশরণজী। সংকল্প , সমর্পণ ও চ্যালেঞ্জের সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করার প্রতিমূর্তি তিনি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের রাষ্ট্রকল্যাণের জন্য মানুষ নির্মাণের যে দর্শন, তার রূপ আমরা পরাশরণজীর মধ্যে দেখতে পাই। শ্রী পরাশরণজীকে সম্মানস্বরূপ শাল, মানপত্র এবং এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মানে ভূষিত হবার পর শ্রী পরাশরণজী বলেন, 'কোনো কাজ বা লক্ষ্যপূরণ সংকল্পের ফলেই সাকার হয়, আর এই সংকল্প ভগবানই করিয়ে নেন। জগতের সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত। অযোধ্যা শ্রীরামজন্মভূমি মামলার জয়লাভে আমি তো কেবল নিমিত্তমাত্র ছিলাম।' স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বাজাজ।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের মহাসচিব চম্পত রায় বলেন, ' এই জয়লাভের জন্য ভগবান শ্রীরাম মাধ্যম করেছেলিন পরাশরণজীকে। এটা কেবল মন্দিরের জয় নয়, এটা হিন্দুত্বের জয়।' বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীধর ওয়েম্বু তাঁর সভাপতির ভাষণে পরাশরণজীর রাষ্ট্রভক্তি ও রামভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশিষ্ট অতিথি তথা বিশিষ্ট আয়কর পরামর্শদাতা সজ্জন কুমার তুলসীয়ান বলেন, শ্রীপরাশরণজীকে সম্মানিত করতে পেরে কুমারসভা পুস্তকালয় নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ভগবান শ্রীরামের বিষয়ে সংগীত পরিবেশন করেন সুশ্রী সংযুক্তা। উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানান অ্যাডভোকেট অজয় চৌবে, অরুণপ্রকাশ মল্লাবত, নন্দকুমার লঢ়া, মহাবীর দম্মাণী, কমল বাংগড় ও ওয়েম্বু আইয়ার। কুমারসভা পুস্তকালয় - পরিবারের পক্ষ থেকে পরাশরণজীকে শ্রীরামচন্দ্রের একটি চিত্র উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়। চয়ন সমিতির প্রবীণ সদস্য লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা স্বামী গোবিন্দ দেবগিরি মহারাজের প্রেরিত সন্দেশ পাঠ করেন।

উপস্থিত ছিলেন মুরুগন গ্রুপের চেয়াম্যান, তামিলনাড়ু রাজ্যের অ্যাডিশনাল সলিসিটর, শ্রীমতী জয়ন্তী নটরাজন, এস গুরুমূর্তি, শ্রীচন্দ্রশেখর, রবিকুমার, রামকুমার, অ্যাডভোকেট যোগেশ্বরণ, অ্যাভোকেট হিমাদ্রি মুখার্জি, বিনোদ সুরাণা, সতীশ পরাশরণ, কপূর সেঠিয়া, মঙ্গলচন্দ্র ডুঙ্গরওয়াল। এছাড়াও অনলাইন মাধ্যমে দেশের বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করেন ড. তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের উপাধ্যক্ষ ভাগীরথ চাণ্ডক।

সংস্কার ভারতীর স্বাধীনতা-৭৫ অমৃত সন্ধ্যা

গত ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের অনুষ্ঠান স্বাধীনতা-৭৫ অমৃত সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. আশিস গিরি। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা তপন গাঙ্গুলি। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সংস্থাপক সদস্য সুভাষ ভট্টাচার্য এবং রাজ্য সভাপতি ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। ড. গিরি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে সেই সংস্কৃতিকেই বুঝি যা আমাদের বৈদিককাল থেকে বেদ-উপনিষদের মাধ্যমে বহমান রয়েছে। ভারতবর্ষের নাট্যশাস্ত্র সাংস্কৃতিক আত্মার সঙ্গে যুক্ত। আমরা সেই নাট্যশাস্ত্রকে অনুধাবন করে তার চর্চার মাধ্যমে জনমানসে তার বিকাশ ও প্রসারের জন্য কাজ করে চলেছি। পরবর্তী পর্যায়ে সমবেতভাবে তিনটি নাটকের গান পরিবেশন করেন সংস্থার উত্তর কলকাতা জেলার উত্তর কলকাতা, বাগুইআটি ও দেশবন্ধু চর্চাকেন্দ্রের শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথের ১টি এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ২টি গানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে গানগুলি সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়। দক্ষিণেশ্বর চর্চাকেন্দ্রে শিল্পীরা পরিবেশন করেন শ্রীঅরবিন্দের প্রয়াণ বার্ষিকীকে স্মরণ করে গীতিআলেখ্য— ভারতাবিন্দ। রিয়া বাহাদুরের সাবলীল আলেখ্য- আবৃত্তি এবং ময়ূখ মুখার্জির সংগীত পরিচালনায় আলেখ্যটি শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্বে মঞ্চস্থ হয় সুপ্রতীম সরকারের কাহিনি অবলম্বনে সংস্কার ভারতীর রেপার্টরির নাটক 'নাম সুশীল'। নাট্যরূপ-- তপন গাঙ্গুলি। নির্দেশনা--- সুপ্রীতি ভদ্র। স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে এই নাটক আমাদের অজানা অচেনা এক দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা ব্যক্ত হয়েছে, তিনি হলেন সুশীল সেন (সেনগুপ্ত)। নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন হলেও সফল পরিচালনায় এবং পাত্র-পাত্রীদের সাবলীল অভিনয়ে নাটকটি সফলভাবে প্রদর্শিত হয় এবং সকলে প্রশংসা অর্জন করে। নামভূমিকায় পঙ্কজ ভৌমিক, কিংসফোর্ডের চরিত্রে প্রবীর মণ্ডল, অরবিন্দ— মদনমোহন মল্লিক। বারীন ঘোষ— শোভন রায়চৌধুরী। হেমচন্দ্র— সঞ্জয় দাস এবং সুশীলের মায়ের ভূমিকায় কলিকা মজুমদারের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

বহরমপুরে পুস্তক বিপণন কেন্দ্র

গত ১ জানুয়ারি কল্পতরু দিবসের পুণ্যদিনে বহরমপুরে দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে পুস্তক বিপণন কেন্দ্রের আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধদেব মণ্ডল , কল্যাণ সাহা, সুশোভন মুখার্জি, পঙ্কজ মণ্ডল, সুদীপ সিংহ, মন্দার গোস্বামী এবং সঙ্ঘের বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

হুগলী শহরে সঙ্ঘের সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে আলোচনা সভা

গত ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে হুগলী শহরের বৈদিক ভবনে প্রবুদ্ধ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালেজী। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য ভি ভাগাইয়া, সহক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাতো, ক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ বিদ্যুৎ মুখার্জি, ক্ষেত্র কার্যবাহ গোপাল প্রসাদ মহাপাত্র, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, মধ্যবঙ্গ সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস, হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক বীরেন পাল। সভায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ যেমন, আবসরপ্রাপ্ত আইপিএস স্পেশ্যাল আইজি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত জয়েন্ট সেক্রেটারি, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বনামধন্য চিকিৎসক, এভারেস্ট বিজয়ী মহিলা পর্বতারোহী,

ভারতীয় মহিলা কবাডি দলের অধিনায়ক ও এশিয়ান গেমসে রুপো জয়ী খেলোয়াড়, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধিকর্তা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মতুয়া মহাসঙ্ঘের জেলা সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলের পরিচয় প্রদান করেন হুগলী জেলা সম্পর্ক প্রমুখ আনন্দমোহন দাস ও বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকার্যবাহজী ভারতের গৌরবময় অতীত, বর্তমান পরিদৃশ্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা ও নাগরিক কর্তব্য বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

উপস্থিতি ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেন সরকার্যবাহজী। সভা সুচারু রূপে পরিচালনা করেন মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সহ সম্পর্ক প্রমুখ বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিশেষে প্রান্ত সঙ্ঘচালক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হুগলীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তা সম্মেলন

গত ২৯ ডিসেম্বর হুগলী জেলার সাহাগঞ্জ ডানলপ ময়দানে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চারহাজার কার্যকর্তা এই সমাবেশে পূর্ণ গণবেশে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ১০০০ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। সুসজ্জিত মঞ্চ থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালেজী কার্যকর্তা একত্রীকরণের গুরুত্ব, হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা, দেশের গৌরবময় অতীত ও বর্তমান পরিদৃশ্য এবং ভারতকে বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা সম্পর্কে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে অন্যান্য অধিকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য ভি ভাগাইয়া, অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী, ক্ষেত্র কার্যবাহ গোপাল প্রসাদ মহাপাত্র,প্রান্ত কার্যবাহ মনোজ চট্টোপাধ্যায় ও প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেমমন্দিরের প্রধান সন্ন্যাসী স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ।

এই সুশৃঙ্খল সমাবেশে দেশাত্মবোধক গান ও পূর্ণগণবেশে শারীরিক কার্যক্রম (যোগব্যায়াম ও আসন) উপস্থিত সকলের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করে। সমাবেশের অন্তিমপর্বে ধন্যবাদ জানান হুগলী বিভাগ কার্যবাহ সুনীল কুমার বাগ।

কুরুক্ষেত্রে অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের ১৬ তম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন গত ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পাঁচহাজারেরও বেশি প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশেরও ১/২ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী দীপঙ্কর দণ্ডপাটের নেতৃত্বে শতাধিক আইনজীবী এই রাজ্য থেকে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে গোয়ালিয়র বেঞ্চের বিচারপতি জি এস আলুওয়ালিয়া, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীমতী স্বর্ণকান্তা শর্মা উপস্থিত ছিলেন। সান্ধ্যকালীন সত্রে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরণ রিজিজু। এই অধিবেশনে ছয়টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়— (১) আইনি শিক্ষার সংস্কার, (২) বিভিন্ন রাজ্যে বার কাউন্সিলে সদস্য ও সরকারি আইনজীবী হিসেবে মহিলাদের যোগদান বৃদ্ধি, (৩) অ্যাডভোকেট প্রোজেকশন অ্যাক্ট চালু করা, (৪) বিভিন্ন কোর্টের সংস্কার ও সংরক্ষণ, (৫) অভিন্ন পারিবারিক আইন চালু করা এবং (৬) সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়ামের বৈধতা বিষয়ে চর্চা।

হিন্দমোটরে গঙ্গাসমগ্রের অভ্যাসবর্গ

গত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর হুগলী জেলার হিন্দমোটর মাড়োয়ারি পল্লীর শঙ্কর চ্যারিটেবল সোসাটির শঙ্কর বিদ্যালয়ে গঙ্গাসমগ্র দক্ষিণবঙ্গের অভ্যাস বর্গ সম্পন্ন হয়। বর্গে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাসমগ্রের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ অমরিন্দর সিংহ এবং বৃক্ষরোপণ প্রমুখ পবন চৌহান। মধ্যবঙ্গের ৩০ জন কার্যকর্তা বর্গে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলা সঙ্ঘচালক বানোয়ারিলাল সোমানি, নগর কার্যবাহ পবন রাঠী এবং স্থানীয় কার্যকর্তা বিকাশ ধনধনিয়া ও প্রভুজী।

সারা দেশে নানা নামে পালিত হয় মকর সংক্রান্তি উৎসব

প্রবীর কুমার মিত্র

ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিরা জনজাগরণ তথা ধর্ম চেতনার উন্মেষের জন্য বারো মাসে তেরো পার্বণের ব্যবস্থা করে গেছেন। বিশেষ কোনো পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক, ভৌগোলিক প্রেরণাদায়ক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই পার্বণ বা উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে। যেমন মকর সংক্রান্তি, বিজয়াদশমী, রাখিপূর্ণিমা প্রভৃতি। ভারতের আপামর জনসাধারণ ওই বিশেষ দিনগুলিতে ছোটো-বড়ো আকারের উৎসবের আয়োজন করে থাকেন, যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই থাকে জনসম্পর্ক ও জনজাগরণ। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা প্রতিটি সামাজিক ও জাতীয় উৎসবগুলির মূল সুর ধরা আছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। পৌষ বা মকর সংক্রান্তি দেশভক্তির ঐকতানে পালন করা হয়। এবছরও ২০২৩ সালে ১৪ জানুয়ারি, বাংলা ২৯ পৌষ ১৪২৮ শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে শুক্রবার সারা ভারতের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্ঘস্থানগুলিতে মকর সংক্রান্তি পালন করা হবে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমগ্র দেশব্যাপী যে ছয়টি উৎসব পালন করে থাকে তার মধ্যে একটি হলো মকর সংক্রান্তি উৎসব। হিন্দু পরম্পরাগত ৬টি উৎসব সঙ্ঘ পালন করে থাকে। উদ্দেশ্য হলো ভারতের ঐতিহ্য পরম্পরার প্রতি হিন্দুদের সচেতন করে তোলা। বৈজ্ঞানিক ভাবে বললে শীতকালে সূর্য মকরক্রান্তি রেখায় খাড়াভাবে আলো দেয়, এ কারণেই মকর নামের সঙ্গে উৎসবটি জড়িত। তবে সনাতন ধর্মে এর একটা ব্যাখ্যা ও ইতিহাস আছে।

অনন্তকাল ধরে সময় প্রবহমান। সময়ের এই প্রবাহ যতই বেড়ে চলেছে সৌরজগতের বয়স তথা পৃথিবীর বয়সও ততই বেড়ে চলেছে। তার ফলে আজ যেটা নতুন কাল সেটা নতুনত্ব হারিয়ে পুরাতন হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু যেন অতীতের দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রবহমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষ বর্ষপঞ্জীকে বেঁধে দেওয়ায় মনে করে সময় বারবার ফিরে আসে। তাই গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হলেই বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ। এভাবে হেমন্ত, শীত ও বসন্তকাল আসতে থাকে। সেরকম বাংলা বারোটি মাসও আবর্তিত হতে থাকে। এই আবর্তনে প্রতি মাসের শেষ দিন অর্থাৎ যেদিন মাস পূর্ণ হবে সেদিনকে সংক্রান্তি বলা হয়। এভাবে বারোটি মাসে বারোটি সংক্রান্তির মধ্যে বিশেষ ভাবে পৌষ মাসের সংক্রান্তি উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

সংক্রান্তির অর্থ সঞ্চার বা গমন করা। সূর্যাদির এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে গমন বা সঞ্চার করাকে সংক্রান্তি বলা হয়। সংক্রান্তি শব্দটি বিশ্লেষণ করলেও একই অর্থ পাওয়া যায়। সম্-ক্রম্ + ক্তিন্ অর্থাৎ সম্যক (মঙ্গলকর) দিকে ক্রান্তি অর্থাৎ গমন। মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু মকর, কুম্ভ ও মীন এই বারোটি রাশি একটি পর একটি চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। এর ফলে প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রতি মাসে পরিবর্তিত হতে থাকে। পৃথিবীর পরিমণ্ডলে এধরণের পরিবর্তনের মধ্যে সনাতন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে চারটি দিন উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে দুই অয়ন ও দুই বিষুব দিন। দুই অয়ন হলো উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এবং বিষুব হলো মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তি। মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে—

মৃগকর্কটসংক্রান্তিঃ দ্বে
তূদগ্দক্ষিণায়নে।
বিষুবতী তুলামেষে গোলমধ্যে
তথাপরাঃ।।

অর্থাৎ সূর্যের ধনু রাশি ত্যাগ করে মকর রাশিতে সঞ্চার হওয়াকে উত্তরায়ণ সংক্রন্তি, মিথুন রাশি থেকে

কর্কটরাশিতে সঞ্চার হওয়াকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, কন্যারাশি থেকে তুলা রাশিতে সঞ্চার হওয়াকে জলবিষুবসংক্রান্তি, আর মীন রাশি থেকে মেষরাশিতে সঞ্চার হওয়াকে মহাবিষুব সংক্রান্তি বলা হয়। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এই ছয় মাস উত্তরায়ন কাল এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই ছয় মাস দক্ষিণায়ন কাল। সেইজন্য আষাঢ়ের সংক্রান্তিতে দক্ষিণায়ন ও পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ শুরু হয়। অয়নভেদে সূর্যেরও দিক পরিবর্তন হয়। উত্তরায়ণে সূর্যের সঞ্চার হওয়া মাত্র সূর্য দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে এবং দক্ষিণায়নে পুনরায় সূর্য দক্ষিণ দিকে সঞ্চার হতে শুরু করে।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের মহাপ্রয়াণের স্মৃতির জন্য উত্তরায়ন সংক্রান্তি আরও মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব পক্ষের চারজন সেনাপতির মধ্যে তিনিই প্রথম সেনাপতি। উভয় পক্ষের আঠারোদিন যুদ্ধের দশম দিনে সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভীষ্মদেব রথ থেকে মাটিতে পড়ে যান কিন্তু তিনি মাটি স্পর্শ না করে আটান্ন দিন তীক্ষ্ণ শরশয্যায় শুয়ে উত্তরায়ণের অপেক্ষা করে পৌষ সংক্রান্তির দিন যোগবলে দেহত্যাগ করেন। ভীষ্মদেবের এই মহাপ্রয়াণের স্মৃতির জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিকট উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ৩৪তম শ্লোকে বলা হয়েছে—

'অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ যন্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।'

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিকে মকর সংক্রান্তিও বলা হয়। এই দিনে মকর স্নান করার জন্য মাতা যশোমতী বালক শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে পৌষ সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে বলেছেন—

'আসিল যে পৌষ মাস শুনহ রাজন।
দ্বিদশনবম দিন দিল দরশন।।'

অর্থাৎ পৌষ মাস এসে গেছে। এই মাসে ২৯ তারিখ মকর সংক্রান্তি হবে।

যশোমতী বালক কৃষ্ণকে বলছেন—

'রানি বলে কল্য বাপু দিন শুভক্ষণ।
ধনু ত্যাজি মকরেতে আসিবে তপন।।
বলিয়া মকর-যাত্রা তার নাম কয়।
মকরে করিলে স্নান আয়ুবৃদ্ধি হয়।।'

অর্থাৎ আগামীকাল সূর্য ধনুরাশি ত্যাগ করে মকরে সঞ্চারিত হবে বলে দিনটি শুভ। এজন্য একে মকর-যাত্রা বলে এবং উক্ত সময় স্নান করলে আয়ুবৃদ্ধি হয়।

পৌষ সংক্রান্তিকে যেমন উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলা হয়, তেমনি তিল সংক্রান্তিও বলা হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই দিনে তিল দিয়ে তৈরি করা নাড়ু, মিষ্টি ফল ইত্যাদি দিয়ে পূজার নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করে থাকেন। বাঙ্গালির কাছে এই উৎসব মূলত নতুন ফসলের। এই সময় গ্রাম বাঙ্গলার ঘরে ঘরে খেজুর বসে আসে, তৈরি হয় নতুন খেজুর গুড়। নতুন চালের গুঁড়ো, নতুন গুড়, নারকেল আর দুধ দিয়ে তৈরি হয় নানা ধরনের পিঠে। মায়েরা নানা জাতের পিঠে, পায়েস ইত্যাদির আয়োজন করে দিনটিকে যথাযথ ভাবে পালন করেন। দিনটি উৎসবে আয়োজনে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল জনজাতি অধ্যুষিত পুরুলিয়া বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুরে পালিত হয় 'টুসু উৎসব।' প্রতি বছর মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরমেলায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর আগমন ঘটে স্নান উপলক্ষ্যে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে এই উৎসব পালন করা হয়। তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল, গুজরাটে উত্তরায়ণ, অসমে ভোগালি বিহু, পঞ্জাবে-হরিয়ানা-হিমাচল প্রদেশ-জম্মুতে লোহরী, কর্ণাটকে মকর সংক্রমণ, কাশ্মীরে শায়েন-ক্রাত, উত্তরভারত-কেরল- তেলেঙ্গানায় মকর সংক্রান্তি, মধ্যপ্রদেশ-বিহার-ঝাড়খণ্ড-উত্তরপ্রদেশে খিচড়ি। বাংলাদেশে সাকরাইন।

মকর সংক্রান্তি অন্ধকার থেকে আলোয়, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে শীত থেকে উষ্ণতা, শিথিলতা থেকে স্ফূর্তিতে, আলস্য থেকে উদ্যমে, হীনতা থেকে উদারতায়, ক্ষুদ্রত্ব থেকে গুরুত্বে, অবগুণ থেকে গুণে, অকর্মণ্যতা থেকে কর্মঠতায়, বিপন্নতা থেকে সম্পন্নতার দিকে এগিয়ে চলার সংকেত দেয়।

মকর সংক্রান্তি সংক্রমণ অর্থাৎ পরিবর্তনের বোধ জাগারণের দিবস। পরিবর্তন সৃষ্টির নিয়ম। সর্বত্র প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরিবর্তনের দিশা কী হবে তা বিচার করা আবশ্যক। প্রত্যেক পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। যে পরিবর্তন জীবনের রক্ষা ও পুষ্টি বিধান করে, সেই পরিবর্তনই কাম্য। যে পরিবর্তনের দ্বারা সৃষ্টির অস্তিত্ব এবং বিকাশ সূচিত হয় সেই পরিবর্তনই উচিত, বাকি ত্যজ্য। সংক্রান্তির অর্থ সম্যক (সঠিক) দিশায় ক্রান্তি অর্থাৎ যোগ্য দিকে সমগ্র চিন্তন যা সামাজিক জীবনে উন্নয়নকারী ও মঙ্গলকারী। আমাদের দেশে বিভিন্ন মহাপুরুষ দ্বারা দেশ, কাল, পরিস্থিতি ও সমাজ উন্নয়নের আবশ্যকতা অনুসারে সময় সময়ে অনেক ক্রান্তি অর্থাৎ সম্যক দিশায় পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন বলশালী হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ, আচার্য চাণক্য, ছত্রপতি শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রমুখ মহাপুরুষ ক্রান্তি ও পরিবর্তনের দ্বারা অত্যাচার ও অনাচার সমাপ্ত করে, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে শ্রেষ্ঠ মানবীয় মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যে কোনো ক্রান্তি বা পরিবর্তনের জন্য চারটি পর্যায় (ধাপ) অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(১) শাশ্বত সিদ্ধান্তের উপর আধারিত এক বিচার (লক্ষ্য)। (২) বিচারের পূর্ণতার জন্য যোজনা (পরিকল্পনা)। (৩) যোজনা পূর্তির জন্য সংগঠন ও কার্যপদ্ধতি। (৪) সংগঠন ও কার্যপদ্ধতির দ্বারা লক্ষ্য প্রাপ্তি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এই পদ্ধতির দ্বারা সঠিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে ৯৬ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষে কার্যরত আছে।

(১) **বিচার (লক্ষ্য) :** বিচার শাশ্বত সিদ্ধান্তের উপর আধারিত না হলে সর্বগ্রাহ্য হয় না। সঙ্ঘ হিন্দুরাষ্ট্রকে পরম বৈভবে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রেখেছে। এটা কোনো ব্যক্তিগত লক্ষ্য নয়। 'ভারতমাতা কী জয়'-এর জন্য স্বয়ংসেবকরা কার্যরত রয়েছে। এই ভাব সমাজব্যাপী করাই তাদের লক্ষ্য।

(২) **যোজনা :** এই লক্ষ্যের পূর্তির জন্য সমাজ জাগরণ আবশ্যক যার দ্বারা চৈতন্যের উদয় হবে। সর্বসাধারণের মধ্যে চেতনা জাগরণের জন্য সঙ্ঘ দৈনিক শাখার মাধ্যমে সংস্কার প্রদানের যোজনা করেছে।

(৩) **সংগঠন :** দৈনিক শাখার সংস্কারের ফলে পরস্পরকে যুক্ত করার শক্তি অর্থাৎ স্নেহ ভাবের জাগরণ হয়। মন-বচন-কর্মের ঐক্যের ফলে সংগঠন হয়। বিবিধক্ষেত্রে ও গতিবিধির কাজের মাধ্যমে সংগঠনের আধার স্বরূপ স্নেহভাব সর্বব্যাপী ও সর্বস্পর্শী করার জন্যই সংগঠন। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করার কাজই সঙ্ঘ কাজ।

(৪) **লক্ষ্যপ্রাপ্তি :** স্থায়ী পরিবর্তন স্বয়ংসেবকদের আকাঙ্ক্ষিত। স্থায়ী পরিবর্তনের গতি অপেক্ষাকৃত ধীর হয়। ধীর কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। □

সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন কবীর

দীপক খাঁ

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এক একজন মহাপুরুষ উজ্জ্বল দীপশিখা হাতে অন্ধকার দুর্গম পথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এঁরা সমাজের বরেণ্য আচার্য। কঠোপনিষদে তাই তাঁদের তত্ত্ব জেনে নেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আচার্যদেরই আচরণ আমাদের আচরণীয়।

মধ্যযুগে পাঠান-মুঘল রাজত্বকালে ভারতবর্ষের মাটিতে বিদেশি শাসকদের ভয়ে বহু মানুষ স্বধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অনেকেই নিজধর্ম আঁকড়ে ধর্মীয় আচরণ, সামাজিক বিধিকে দৃঢ় নিয়মে বাঁধার তাগিদ অনুভব করেন। হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ— সব ধর্মের পরিমণ্ডলে কঠোর ধর্ম, নিয়ম বিধির অবতারণা করা হয়েছিল। সব ধর্মের পুরোহিতরা মেতেছিলেন বাহ্যিক আড়ম্বরে। শুধু হিন্দু-মুসলমানে নয়, হিন্দুতে হিন্দুতে বাক্‌বিতণ্ডার ফলেও সমস্ত ধর্মে গজিয়ে উঠেছিল বহু সম্প্রদায়। এই ধর্মসংকটকালে স্বামী রামানন্দের প্রচেষ্টায় এক উদার মতের প্রবর্তন হয়েছিল। চামার, চণ্ডাল, তাঁতি, কুম্ভকার— সমাজে যাঁরা পতিত বলে চিহ্নিত ছিল, তাঁদের তিনি শিষ্যরূপে বরণ করেছিলেন। রামানন্দের শিষ্যরাই উত্তরকালে ধর্মের নামে সমস্ত ত্রুটিকে দূর করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য সাধক সন্ত কবীরদাস। স্বামী রামানন্দের শিষ্যমণ্ডলীকে বলা হতো— রামায়েত সাধু। তাঁদের অভিমত ঈশ্বরকে পেতে হলে— ঈশ্বর সৃষ্ট সমস্ত জীবকে ভালোবাসতে হবে।

সুদীর্ঘ ১২০ বছর সময় ধরে কবীর ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন। রাধা-কৃষ্ণ, শিব-দুর্গা, রাম-সীতা অর্থাৎ দেববিগ্রহের পূজা-অর্চনায় সীমাবদ্ধ ছিল না কবীরের ভক্তি-অনুরাগ। ধর্মকে সর্বতোভাবে নীতি-সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য বহু স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। শুধু ভারতেই নয়, মক্কা, বাগদাদ, সমরখন্দ ও বেখরার ধর্মপণ্ডিত পুরোহিতদের সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছিলেন। ধর্মের বুনিয়াদে জাতীয় শুধু নয়, বিশ্ব ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব রচনা করার অভিপ্রায় ছিল কবীরের।

বেদ-কোরান, পুরোহিত-মোল্লা, মন্দির-মসজিদ, তীর্থ-হজ, ব্রত- উপাসনা, উপবাস, রোজা-সন্ধ্যাহ্নিক-নমাজ কিছুই মানতেন না কবীর। মানতেন শুধু অন্তরের পবিত্রতা। কবীরের শিষ্য, প্রশিষ্যদের মৌখিক পরম্পরা বচনগুলির উত্তরকালে প্রচলন ঘটেছে। কবীরের বচনে আছে পঙ্‌ক্তি। দ্বিপদী, চৌপদী, সপ্তপদী এমনকী অষ্ট, দশ, পনেরো বিশ, একুশ ও তার বেশি মিলবদ্ধ ছত্রের সন্নিবেশ আছে তাঁর বচনে।

কবীর গবেষকরা মনে করেন, কবীরবচন বলে আজও যেসব বচন প্রচলিত তা উত্তরকালের কবীরপন্থী সাধুসন্তদের সৃষ্ট। কবীরের জীবনী সমকালে লেখা হয়নি। ফলে বহুল কিংবদন্তীর সমাবেশ ঘটেছে তাঁর জীবনকাহিনিতে। এখন বৈজ্ঞানিক যুগ। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে অলৌকিক বিষয়গুলি কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে তা বলা মুশকিল। এর উত্তর পাবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্যের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। "যোগীরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন। রাশি-রাশি মতবাদ অপেক্ষা সামান্য একটু অভ্যাসের মূল্য অনেক বেশি। সুতরাং আমি নিজে এটা বা ওটা হইতে দেখি নাই বলিয়া সেটা মিথ্যা— এই কথা বলিবার অধিকার আমার নাই। যোগীদের গ্রন্থে আছে, অভ্যাস দ্বারা সর্বপ্রকার বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। ...যে বলে এ সমুদয় মিথ্যা, এগুলির ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নাই, তাহাকে যুক্তিবাদী বা বিচারপরায়ণ বলিতে পারা যায় না। যতদিন না সেগুলিকে ভুল প্রমাণ করিতে পারিতেছে। ততদিন সেগুলিকে অস্বীকার করিবার অধিকার তোমার নাই।।..."

(স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা' ২য় খণ্ড)

সাধক কবি কবীরদাসের ১৩৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, পূর্ণিমা তিথিতে সোমবার কাশীর লহরতলায় জন্ম হয়। কবীরপন্থীরা

এজন্য জ্যৈষ্ঠ মাসে বট সাবিত্রী তিথিতে কবীরের জন্মোৎসব পালন করেন। কবীরের জন্ম অর্থাৎ আবির্ভাব নিয়ে আছে কিংবদন্তীমূলক কাহিনি। কাহিনিটি এরূপ :

ভারতবর্ষের এক বিশেষ তীর্থস্থান হলো উত্তরভারতের কাশীধাম। এই কাশীধামে এক সৎ ব্রাহ্মণ তার বালবিধবা কন্যাকে নিয়ে স্বামী রামানন্দের আশ্রমে গিয়েছিলেন। আশ্রমে গিয়ে ওই কন্যা ভক্তিভরে স্বামী রামানন্দকে প্রণাম করেন। উত্তরে স্বামী রামানন্দ বলেন— সৎ পুত্রের জননী হও মা।

ফলে দৈবের নির্দেশে, দৈব উপায়ে ভবিষ্যতে জন্ম নেবেন এক মহাসাধক। যাইহোক, রামানন্দের আশিস বাক্য শুনে ব্রাহ্মণ ও কন্যার ভয় দূরীভূত হয়। রামানন্দের মতো ঋষিতুল্য ধর্মগুরুর বাক্য তো বিফল হবে না। তিনি সত্যদ্রষ্টা ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

বুদ্ধের জন্মের আগে মা মায়াদেবী স্বপ্নে দেখেছিলেন, শ্বেতশুভ্র এক হাতি তাঁর জঠরে প্রবেশ করছে। মহানাগ অর্থাৎ হস্তীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবতা— এ কারণেই তথাগত বুদ্ধের একটি নাম 'মহানাগ'। শ্রীরামকৃষ্ণের মা চন্দ্রমণি দেবীও দৈবকৃপায় গর্ভবতী হয়েছিলেন, তিনি দেখেছিলেন মন্দিরের দেববিগ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত আলো তাঁর গর্ভে প্রবেশ করছে। তমসাকালে সংকট প্রকট হলে ঈশ্বর কি নিজেই মর্ত্যে আসেন না ধর্মকে রক্ষা করতে? কবীরের পরম অনুরক্ত শিষ্যরা মনে করেন— দেবাদিদেব শিবের নির্দেশে ব্রহ্মচারী শুকদেব 'ভাগবত কবীর' রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন লোককল্যাণের জন্য। ইতিহাস নির্ভর কোনো তথ্য না থাকায় এ প্রসঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কথা মেনে নেওয়াই শ্রেয়।

'কবীর যে জোলার সন্তান তাহাও তো কেহ কেহ মানিতে চান না। তাঁহারা বলেন আসলে কবীর ব্রাহ্মণ সন্তান। মুসলমান জোলা তাঁহাকে কুড়াইয়া পাইয়া পালন করেন মাত্র। আর গোঁড়া সাম্প্রদায়িকরা বলেন, কবীর স্বয়ং নারায়ণ, তিনি আপনাকে লহরতলাতে প্রকট করলে জোলানিমা তাঁহাকে পালন করেন।'

পালক পিতা হলেন নুর শেখ সংক্ষেপে নীরু। পালিতা মায়ের নাম নীমা। নীরু ও নীমা ছিলেন জোলা জাতের মুসলমান। 'জলাহ' ফারসি শব্দ থেকে জোলা শব্দটি এসেছে। শব্দটির অর্থ তাঁতি। জোলা নামে চিহ্নিত মানুষেরা আগে ছিলেন হিন্দু। অনেকের মতে, হিন্দু যোগী, যাঁরা নাথপন্থী, যাঁদের সাধনায় হঠযোগের প্রাধান্য আছে, তাঁদেরই একটি দল সমাজপতির চাপে বাধ্য হয়ে নিজদের ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়েছিল। যাইহোক, নীরু ও নীমা পরম স্নেহে পালন করতে শুরু করেছিলেন শিশুপুত্রটিকে। অলক্ষুণে সব ভাবনায় ভীত হয়ে কাজি মোল্লারা নীরুকে বলেছিলেন— বড়ো হয়ে ছেলেটা বিপত্তি ঘটাবে। কী দরকার এ ছেলেকে লালনপালন করে বড়ো করার? বরং এটাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দাও।

লোকশ্রুতি, মোল্লাদের মন্ত্রনায়, কাজির উসকানিতে নীরু এক ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুপুত্রের শরীরের মোক্ষম স্থানে আঘাত করেছিলেন। কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি। রক্তমাংসে গড়া শিশুটির শরীরে ছিল অসাধারণ তেজ, অসীম বল, যা নিঃশেষিত করা সহজ নয়। কোরানে পাওয়া কবীর নামটিই বেছে নেওয়া হয়েছিল এই পালিত পুত্রটির জন্য। কবীর প্রথাগত শিক্ষা লাভ করেননি। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন— অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার বলে সর্ববিধ জ্ঞানেই তাঁহার অব্যাহত প্রবেশ ছিল'। প্রতিভার বলেই তিনি তাঁর মাতৃভাষায় অর্থাৎ হিন্দি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কবীরের পালক পিতা নীরু শেখের প্রতিবেশীরা সকলেই ছিলেন হিন্দু। 'মসী কাগজ ছুআ নহী'— কালি কাগজ ছোঁননি কবীর, কিন্তু মুখে মুখে রচনা করেছিলেন অনুপম শব্দ সহযোগে আধ্যাত্মিক ভাবোদ্যোতক বহুপদ বা বচন। মূর্তিপূজা, বর্ণবিচার, ছোঁয়াছুয়ি এসব মানতে না। সব ধর্মের মানুষের কাছে তিনি যেতেন, সবার সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতেন।

কবীর 'রামনাম করতেন। 'রাম' মানে দশরথ পুত্র রাম নন। রাম অর্থাৎ যিনি আত্মাকে রমণ করেন। স্থূল, জড় জগতের ঊর্ধ্বে যিনি আত্মময় তিনিই রাম। শ্রীবিষ্ণু, শ্রীহরির প্রতিশব্দ রাম। জাত ব্যবসায় কবীরের মন ছিল না। তাঁত বুনতে গিয়ে তাঁর কাজে ভুল হতো। হাটে গিয়ে কেনা-বেচা— তাতেও আগ্রহ ছিল না। মা ও বাবা বকাবকি করলে কবীর বলতেন— ওসব কাজ ভালো লাগে না। ওসব কাজ করতে গেলে রামনাম ভজন করা যায় না।

ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ পণ্ডিত গবেষকরা কবীর বচন ও অন্যান্য তথ্যাদি ঘেঁটে বলেছেন— কবীর দাস ছিলেন গৃহস্থ ও সংসারী। ক্ষিতিমোহন সেনের কথায়— 'রামানন্দের শিষ্য হইলেও তিনি গৃহস্থ সন্ন্যাসী ছিলেন। লোঈ তাঁহার পত্নী। কাপড় বুনিয়া খাইতেন। অল্পাহারী, শীর্ণ, ধ্যানমগ্ন, সদানন্দ এই গৃহস্থ সাধুটি দীর্ঘজীবী ছিলেন। পুত্রের নাম রাখেন কামাল অর্থাৎ ভাগ্যের পরিপূর্ণতা। কন্যার নাম রাখেন 'কামালী'। এখনকার সাধুরা সেই সব সহজ কথা নানা অসম্ভব কথা দ্বারা চাপিয়া ফেলিতে চাহেন, যেন এরূপ গৃহস্থ জীবন একটা নিন্দার কথা।..'

ক্ষেত্র বিশেষে, পরিস্থিতির চাপে মহাপুরুষরা তাঁদের বিভূতি প্রদর্শন করতে বাধ্য করে থাকেন। বিভূতি, সিদ্ধাই প্রভৃতি সব তাঁরা নিজে থেকে দেখাতে চান না। বলেন, ওসব করলে ঈশ্বর থেকে যে মন দূরে সরে যায়।

কবীর শ্রমজীবী সত্ত্বেও ছিলেন পরোপকারী। বিশিষ্ট কবীর গবেষক তেওয়ারীর বই থেকে জানা যায় এই তথ্য :

'A Saint Called Anontadas wrote a biography of Kabir in 1645. He called it kabir Sahebki Parchai, in which he says that kabir carried on the occupation.' □

বহুত্বের পুণ্যভূমিতে জেহাদের অশনি সংকেত

অনির্বাণ দে

মাত্র কয়েক মাস আগের কথা। এক রাজনৈতিক দলের এক মুখপাত্রের কোনো বিশেষ একটি মন্তব্যের জেরে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বিক্ষিপ্ত হিংসা। প্রকাশ্যে বীভৎসভাবে খুন হয়েছেন একের পর এক নিরীহ অসহায় সাধারণ মানুষ, যাঁরা ধর্মপরিচয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী। প্রতিবাদের নামে ধ্বংসাত্মক জঙ্গি আন্দোলনে দিনের পর দিন অবরুদ্ধ থেকেছে দেশের রাজপথ। বিনষ্ট সরকারি সম্পত্তির পরিমাণ বহু কোটি ছাড়িয়েছে। সুযোগ বুঝে দেশজুড়ে শরিয়া কায়েমের অভিপ্রায়ে সক্রিয় হচ্ছে বিভিন্ন ইসলামি জঙ্গি সংগঠন। পরিস্থিতি দেখেশুনে ভারতের নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষের একাংশের মনে আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, 'এত বিপুল সংখ্যক মানুষ যাঁরা এমন অশান্তি করছেন, তাঁরা কি সত্যিই ভারতীয়? নাকি দেশটাই আবার ভেঙে যাওয়ার পথে?'

অর্থাৎ দেশের নাগরিকের মনে ভারতীয়ত্বের ধারণার সঙ্গে বেশ কিছু মানুষের আচরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে না। সেই ধারণা ঠিক কীরকম? ভারতবর্ষ বহু ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর দেশ। এই প্রতিটি বিষয়ের ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচিত্র জীবনচর্যার বহু সহস্রাব্দ প্রাচীন সহাবস্থান এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহলে ভারতীয়রা কি কোনো নির্দিষ্ট জাতি? ইংল্যান্ডের শিক্ষাবিদ ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যার অ্যালফ্রেড একার্ড জিমার্ন বলেছিলেন, 'Nationality is a thing which the national can feel rather than define'। অধ্যাপক বার্নার্ড জোসেফ জাতীয়তা বিষয়টির ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'Nationality as a quality is the subjective corporate sentiment permanently present in and giving a sense of distinctive unity to the majority of the members of a particular civilised section of humanity, which at the same time objectively constitutes a distinct group by virtue of possessing certain collective attributes peculiar to it such as Homeland, language, religion, historym culture or traditions'। অর্থাৎ জাতি হলো সম্প্রদায়গত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে অন্তরের ঐক্যের বন্ধনে সৃষ্ট একটি সত্তা যার সকল সদস্যের নিজ মাতৃভূমিকে ঘিরে রয়েছে একই ইতিহাস, একই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ। সেই সূত্র ধরেই এমএস গোলওয়ালকর তাঁর বিখ্যাত অনুবাদ গ্রন্থ 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড'-এ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি জাতিগঠন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'culturally, linguistically they must become one with the National race...they must be 'Naturalized' in the country by being assimilated in the Nation wholly.' কবিগুরুর ভাষায়, এ এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে দেশে আগত বা জন্মগ্রহণকারী মানুষেরা 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।'

ভারতের মতো প্রাচীন দেশে জাতিগঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ধর্ম। কিন্তু ধর্ম কথাটি উচ্চারণ করলেই যেন মনে ভেসে আসে মূলত দুটি জাতির নাম— হিন্দু ও মুসলমান। যদিও হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম ভারতবর্ষের আদিধর্ম বা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন জীবিত ধর্ম। এ ধর্মের ভিত্তি হলো সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও সর্বজনীন গ্রহণশীলতা। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ধর্মেরই এক সন্ন্যাসী সারা পৃথিবীর উদ্দেশে বলেছিলেন, 'I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.'

এই বর্ণনার মধ্যে আসলে হিন্দুত্বের সঙ্গে ভারতীয়ত্বের ধারণাটি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এবং শুধু হিন্দুধর্মমতই নয়, ভারতে উদ্ভূত যে কোনো ধর্মই এই দর্শনের অনুসারী,

ফঃ ৫

বলা যায় তাই হলো যথার্থ ভারতীয় ধর্ম। কারণ হিন্দু কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রণীত সুনির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে গঠিত ধর্ম নয়। এ হলো এক মুক্ত ও সহনশীল জীবনচর্যা যেখানে ধর্ম কথাটির অর্থ ন্যায়পরায়ণতা। ফরাসি বংশোদ্ভূত গ্রন্থাকার, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রণী প্রচারক ড. সাবিত্রী দেবী মুখার্জির ব্যাখ্যায়, ''Two Indians, of whom one believes in God and one does not, are two Hindus, provided they both share that culture and civilisation which is the only thing all Hindus are supposed to have in common, which is, really, 'Hinduism'.''

অর্থাৎ এই ভারতীয়ত্বের মূল ধারণার মধ্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে ঐক্যের ভাবনা আছে, তা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নয়, তা হলো সাংস্কৃতিক ঐক্য। ভারতীয় জাতীয়তা তাই আদৌ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে নয়, বরং এই বিশেষ উপলব্ধির ওপর গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছর ধরে। যাঁরা এই দেশকে নিজের মাতৃভূমি বলে মনে করেন, তাঁদের সকলে ভারতীয়ত্বের এই উদার ভাবনায় পরস্পর সম্পৃক্ত হয়েই গড়ে তুলেছেন দেশের এই মহান ঐক্য। সেখানে ভারতের মাটিতে সৃষ্ট হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন যেমন আছে তেমনি আছে বিদেশ আগত খ্রিস্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই। এই ভাবনাটি যে যার মতো করে ভাবতে পারে। যেমন হিন্দু বিশ্বাসে ঋষি দক্ষের কন্যা ও মহাদেব শিবের পত্নী সতীর দেহাংশের একান্ন খণ্ড একান্ন পীঠ যা তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরম পবিত্র বলে স্বীকৃত। পেশোয়ার থেকে সীতাকুণ্ড। মানস সরোবর থেকে জাফনা। একে সাবিত্রী দেবী বলেছেন, 'Sati is India herself, personified; Indian soil, sacred from end to end, with all its variety, the actual body of one great goddess. The consciousness of Indian unity nothing but this feeling. And Indian nationalism means devotion to this geat Goddes.'

ড. রাকেশ সিনহা তাঁর 'গুরুজী অ্যান্ড ইন্ডিয়ান মুসলিম' বইটিতে জাতীয়তার (nationality) বিষয়ে শ্রীগুরুজীর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'The concept of Motherland is a common point of assimilation of Muslims with the culture. It is the supreme religion...It establishes an organic link between the people and the land and its culture and history.' সেই organic link হলো এমন এক সূত্র যা এই পবিত্র মাটিতে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষকে তাদের নিজ নিজ পথেই সেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাবার পথ করে দেয়। যে পথের হদিশ ফুটে ওঠে শিবমহিম্নাস্তোত্রের শ্লোকটিতে—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পযসামর্ণব ইব।।
(শিবমাহিম্নস্তোত্র ৭)

যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলধারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হতে উৎসারিত হলেও সকলের জল গিয়ে সাগরে মিলিত হয়, তেমনই (হে প্রভু) ভিন্ন ভিন্ন যেসকল পথ, সরল হোক বা বক্র, মানুষ (তাদের) ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে গ্রহণ করে, তা বিভিন্ন মনে হলেও তারা সকলেই তোমাতে গিয়ে মেশে।

অপরদিকে এই ধারণার ঠিক বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আরেকটি গোষ্ঠীর কিছু মানুষের আচরণ! এমন এক আচরণ, যার মূলে রয়েছে এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক মানসিকতা। এখন ভারতের মতো বহু সম্প্রদায়ের বাসভূমিতে সাম্প্রদায়িক আবেগ ব্যাপারটা মোটেও নতুন নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষা-ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই ঘটনাটি এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত। এমন সম্প্রদায়, যার একাংশের মধ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে দেশে এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা গভীরভাবে প্রভাবিত করে চলেছে দেশের জনবিন্যাসকে এবং সেই সূত্র ধরে ভারত রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রের গঠন তথা বিবর্তন প্রক্রিয়াকে। শুধু দেশের ভিতরেই নয়, দেশের সীমান্তের ওপারের জনবিন্যাসের ভূমিকাও এইসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ভারতের মতো দেশে যেখানে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতো ইসলামিক দেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে নিতে হয় সেখানে এমন উদ্বেগের বিশেষ কারণ রয়েছে বই কী।

কী সে কারণ? বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় আগ্রাসনের প্রসঙ্গে ইজারায়েলের হাফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত পঠনপাঠন বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক গ্যাব্রিয়েল বেন-ডর এবং তাঁর সহগবেষক আমি পেদাজুর তাঁদের এক প্রবন্ধে (দ্য ইউনিকনেস অব ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম অ্যান্ড দ্য ফোর্থ ওয়েভ অব ইন্টারনাশনাল টেররিজম, ২০০৩) উল্লেখ করেছিলেন, ''Islamic Fundamentalists are able to penetrate the political system of other countries, in the name of Islam... It is conceivable for Iran to dominate, at least for a while, politics in the Sudan, to have big impacts in Lebanon and so on, at a time when such ideological-religious penetration is very rare in other places in the world...Of curse there is a Jewish fundamentalism... but it can not penetrate anything outside Israel. And there is a Christian fundamentalism and of course, there are many Christians in different places around the world... yet their ability, indeed their ambition, to penetrate the social and political fabric of other countries has been extremely limited in practice.'' এখন, এই ধরনের মানসিকতা প্রসারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আরেকটি বিষয় হলো এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা, যার বৃদ্ধির হার দেশে তথা সমগ্র বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এই দুই উপাদান মিলে যখন দেশবাসীর মনে নিজের দেশের অস্তিত্ব সম্পর্কেই এমন এক সংশয় জন্ম দেয়, তখন পরিস্থিতির ওপর বাড়তি সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরি হয়ে পড়ে বই কী!

পরিযায়ী ভোটদাতাদের জন্য আরভিএম প্রযুক্তি আনছে নির্বাচন কমিশন

অনুপ চন্দোক, পিআইবি।। উন্নত প্রযুক্তির যুগে পরিযায়ীরা ভোট দিতে পারবেন না এটা হতে পারে না। ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে ভোটদাতার শতকরা হার ছিল ৬৭.৪ শতাংশ। ৩০ কোটির বেশি ভোটদাতা ভোট না দেওয়ায় এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটদাতা ভোট না দেওয়ায় এবং সেইসব অঞ্চলে ভোটদানের হিসেবে পার্থক্য থাকায় নির্বাচন কমিশন উদ্বিগ্ন। মনে করা হচ্ছে যে নতুন আবাসস্থলে ভোটদাতা হিসেবে নাম নথিভুক্ত না করার অনেক কারণ আছে। ফলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধাও হারাতে হয় সেই ব্যক্তিকে। ভোটদানের হার বাড়াতে যে মূল সমস্যাটির সমাধান করতে হবে সেটি হলো, অভ্যন্তরীণ পরিযায়ী হওয়ার কারণে যারা ভোট দিতে পারেন না তাদের ভোটদানের ব্যবস্থা করা। যদিও দেশের মধ্যে পরিযায়ী সংক্রান্ত কোনো কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার নেই, তবুও প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে জীবিকা, বিবাহ ও শিক্ষার প্রয়োজনে অনেকেই পরিযায়ী হন। সার্বিক অভ্যন্তরীণ পরিযায়ীদের সিংহভাগ অংশই গ্রামের মানুষ।

অভ্যন্তরীণ পরিযায়িতার মোটামুটি ৮৫ শতাংশ হয় নিজ রাজ্যের মধ্যেই। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব নেওয়ার পরে পরেই রাজীব কুমার অভ্যন্তরীণ পরিযায়িতা সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারেন তাঁর চামুলি জেলার দুমক গ্রামে ট্রেকিং থেকে। তাঁর নজর ছিল পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের বর্তমান বাসস্থান থেকেই যাতে ভোট দিতে পারেন তার ওপর। এই উদ্যোগের আইন ও বিধিগত দিক, প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা অনুধাবন করে নির্বাচন কমিশন দীর্ঘ আলোচনা চালায় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে, যাতে আর্থ-সামাজিক সব শ্রেণীর পরিযায়ীরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন। এর জন্য টু-ওয়ে ফিজিকাল ট্রানজিট, পোস্টাল ব্যালট, প্রক্সি ভোটিং, বিশেষ ভোটদান কেন্দ্রে আগেভাগেই ভোটদান, একমুখী অথবা দ্বিমুখী ইলেকট্রনিক ট্রান্সমিশন অব পোস্টাল ব্যালটস্ (ইটিপিবিএস), ইন্টারনেট ভিত্তিক ভোটদান ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো বিকল্প ভোটদান পদ্ধতি খুঁজে বের করা হয়।

সর্বজনগ্রাহ্য, নির্ভরযোগ্য এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তিগত সমাধান খোঁজার লক্ষ্য নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুই নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্র পাণ্ডে ও অরুণ গোয়েলের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন বহু পরীক্ষিত এমথ্রি ইভিএম মডেলটির আধুনিকতম সংস্করণটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার দ্বারা অভ্যন্তরীণ পরিযায়ীরা তাদের নিজস্ব নির্বাচন ক্ষেত্রের বাইরে কোনো দূরতম স্থান থেকে ভোটদানে সক্ষম হবেন। ফলে পরিযায়ী ভোটদাতাদের তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে নিজ নিজ বাসভূমে ফিরতে হবে না।

অভ্যন্তরীণ পরিযায়ীদের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সমস্যা, আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ করা, ভোটদাতার গোপনীয়তার নিশ্চিতকরণ, ভোটদাতাদের পরিচয় নির্ধারণের জন্য পোলিং এজেন্টের সুবিধা, দূরতম স্থানে ভোটদানের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি এবং ভোট গণনা-সহ অন্য বিষয়গুলি তুলে ধরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি প্রস্তাবপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ পরিযায়ীরা যাতে তাদের নিজ নিজ নির্বাচন ক্ষেত্রে বাইরে থেকে ভোটদানে অংশ নিতে পারেন তার জন্য কমিশন একটি নামি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি মাল্টি কনস্টিটিউয়েন্সি রিমোট ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (আরভিএম) কাজে লাগাতে প্রস্তুত। ইভিএম-এর এই আধুনিক সংস্করণ দূরতম একটি মাত্র পোলিং বুথ থেকে ৭২টি নির্বাচন কেন্দ্রে কাজ করতে সক্ষম। যদি এই উদ্যোগ রূপায়িত হয় তাহলে পরিযায়ীদের জন্য সামাজিক রূপান্তর ঘটবে এবং নানা কারণে কাজের জন্য যাওয়া স্থানে নাম নথিভুক্ত না করার অনীহা দূর হবে।

কমিশন মাল্টি কনস্টিটিউয়েন্সি প্রোটোটাইপ রিমোট ইভিএম-এর কার্যকারিতা দেখাতে ১৬.০১.২০২৩-এ স্বীকৃত ৮টি জাতীয় এবং ৫৭টি রাজ্য রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত থাকবেন। একই সঙ্গে কমিশন স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে ৩১.০১.২০২৩-এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এবং ভোটদানের প্রক্রিয়া, আরভিএম প্রযুক্তি সংক্রান্ত যে কোনো পরামর্শ বা মতামত দিতে বলেছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনের মতামত এবং ইভিএম-এর কার্যকারিতার ভিত্তিতে কমিশন দূরতম স্থানে ভোটদান পদ্ধতি রূপায়ণের প্রক্রিয়া যথাযথ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

(লেখক যুগ্ম অধিকর্তা, মিডিয়া)

সংস্কার ভারতীর নতুন নাটকে অগ্নিযুগের মর্মস্পর্শী নির্মাণ

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

গত ৫ ডিসেম্বর ২০২২ সোমবার মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হলো সুপ্রতীম সরকারের কাহিনি অবলম্বনে সংস্কার ভারতী রেপাটরি নাটক 'নাম সুশীল'। নাট্যরূপ—তপন গাঙ্গুলি। নির্দেশনা—সুপ্রীতি ভদ্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত এই নাটকে এমন একজন দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা ব্যক্ত হয়েছে যাঁর কথা এতদিন আমাদের তেমন ভাবে জানা ছিল না। পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনে অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের বন্দুকের মুখে বুক চিতিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন শত শত যুবক-যুবতী। ব্রিটিশের জেলখানায় নিদারুণ অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেছেন শত শত বিপ্লবী। যাঁদের মধ্যে অনেকের কথা আমাদের চেনা জানার মধ্যে থাকলেও অনেকেই অচেনার গণ্ডীর মধ্যেই রয়ে গিয়েছেন। তেমনই একজন বিপ্লবী— সুশীল সেন (সেনগুপ্ত)।

তীক্ষ্ণ মেধার সুশীল সেন ১৮৯১ সালে শিলঙে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কৈলাশ চন্দ্র সেন ছিলেন শিলঙের আইজি কারা বিভাগের প্রধান করণিক। শৈশব থেকে কৈশোরে পা রাখেন দেশব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধিতার আবহে। ১৯০৫ সালে তিনি সিলেটের জ্ঞানেন্দ্রনাথ ধরের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে সিলেটে অনুষ্ঠিত সুরমা ভ্যালি পলিটিক্যাল কনফারেন্সে বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ভর্তি হন ন্যাশানাল স্কুলে এবং সেই সঙ্গে বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির কাছে জিমন্যাস্টিকের পাঠ নেওয়া শুরু করেন। মহান বিপ্লবী বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ঠিক করেন,

অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য সুশীল সেন ও প্রফুল্ল চাকীকে পাঠাবেন বিহারের মুজফ্‌ফরপুরে। কিন্তু হঠাৎই সুশীল সেনের পিতা মরণাপন্ন হওয়ায় বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ তাঁকে জোর করে পাঠিয়ে দেন সিলেটে। পরবর্তী জীবনে চব্বিশ বছরের যুবক সুশীল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আরও সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়েন বাঘাযতীনের সঙ্গে। ১৯১৫ সালে নদীয়ার এক গোপন সশস্ত্র অভিযান চালাতে গিয়ে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন সুশীল সেন।

'নাম সুশীল' নাটকে সুশীল সেনের এই আত্মত্যাগের কথা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন সংস্কার ভারতী রেপার্টারির শিল্পীরা। নাম ভূমিকায় পঙ্কজ ভৌমিকের অভিনয় ছিল অনবদ্য। এই সঙ্গে কিংসফোর্ডের চরিত্র চিত্রণে প্রবীর মণ্ডল এবং পুলিশ অফিসার প্রবীর ঘোষের অভিনয় অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের কথা আমাদের নতুন করে মনে করিয়ে দিল। এছাড়া বারীন ঘোষের ভূমিকায় শোভন রায়চৌধুরী। হেমচন্দ্র— সঞ্জয় দাস। অরবিন্দ— মদনমোহন মল্লিক। সুশীলের মায়ের ভূমিকায় কলিকা মজুমদারের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিক ভাবে নাটকের সকল চরিত্রেরই সামগ্রিক অভিনয় একটি সুন্দর ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে যার ফলে নাটক একটা সাবলীল গতিতে এগিয়ে গিয়েছে এবং সফলতা লাভ করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য নাটকের শুরুতে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্যের দৃশ্যের অবতারণা করে পরিচালক সুপ্রীতি ভদ্র চমক দিয়েছেন।

এছাড়াও বেশ কিছু নাট্য মুহূর্ত খুব ভালো লাগলো, যেমন আদালত চত্বরের দৃশ্যপট বা সব শেষে সুশীলের মৃত্যুদৃশ্য ছিল খুব মর্মস্পর্শী। জয়ন্ত মুখার্জীর আলোর দৃশ্যায়ন যেমন ভালো লাগলো, তেমনই রানা দাসের আবহসংগীতও ছিল দৃশ্যানুযায়ী উপযুক্ত। সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ছিল যথাযথ। এটাই ছিল এই নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন। □

অ্যাসিড আক্রান্ত নির্যাতিতাদের প্রেরণাদাত্রী ডা. মহালক্ষ্মী

বিশেষ প্রতিনিধি॥ চিকিৎসক মহালক্ষ্মী ওয়াই এন। মহীশূরের অ্যাসিড আক্রান্ত এই সাহসিনী দীর্ঘ ১১ বছর ধরে বিচারের আশায় দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সমাজ তার বিপদের দিনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তবু হাল ছাড়েননি তিনি। তিনি ঘরপোড়া গোরু। তাঁর আশেপাশে সমাজের অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে যখনই খারাপ কিছু ঘটে যায় ছুটে যান তিনি। নির্যাতিতার দুঃখ-যন্ত্রণা ভাগ করে নেন। শুধু তাই নয়, চিকিৎসক হওয়ার দায়বদ্ধতাও ভোলেননি তিনি। এখনও গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েন আর্ত-রোগীদের সেবা করতে।

মহালক্ষ্মীর যখন ২৬ বছর বয়স, তাঁর ভাড়া নেওয়া ক্লিনিকের বাড়িওয়ালা তাঁকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রত্যাখ্যানের পর সে তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করত, নোংরা প্রস্তাব দিত। মহালক্ষ্মী থানায় ছেলেটির নামে অভিযোগ করেন। তারপরই ২০০১ সালের ১১ জানুয়ারির রাতে ক্লিনিক থেকে বাড়ি ফেরার পথে সেই যুবক মহালক্ষ্মীর মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারে। রাস্তায় পড়ে তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন তিনি। কিন্তু সে রাতে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে আসেনি। প্রত্যেকেই নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছিলেন। একটু জল নিয়েও কেউ তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। দীর্ঘ সময় লেগেছিল মহালক্ষ্মীর সুস্থ হতে। ততদিনে একটি চোখ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। সুস্থ হয়ে আবার কর্মস্থলে ফিরে আসেন। মহালক্ষ্মী বলেন, 'যে সমাজকে আমি নিজের মনে করতাম, বিপদের দিনে তারা কেউ পাশে দাঁড়ায়নি। তার জন্য আমি একটুও হতাশ হইনি। বরং আরও বেশি করে সমাজের সেবা করতে চেয়েছি।'

তারপর মানসিক ট্রমা থেকে বেরিয়ে আসার লড়াই শুরু হয়। এই লড়াইয়ে মহালক্ষ্মী পাশে পেয়েছিলেন বাবা-মা ও দুই বোনকে। মানসিক ট্রমা কাটিয়ে ওঠার পর অভিযুক্ত ওই যুবকের বিরুদ্ধে একটানা ১১ বছর আদালতে দৌড়ঝাঁপ করতে হয় সুবিচার পাওয়ার জন্য। ২০১২ সালে কর্ণাটক বিচারালয় মহালক্ষ্মীর ওপর অ্যাসিড হামলার ওই আসামিকে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। সেসময় ভারতে মেয়েদের ওপর অ্যাসিড হামলায় তেমন গুরুতর শাস্তির নিদান ছিল না। কিন্তু ডাঃ মহালক্ষ্মীর লড়াই বিচারব্যবস্থাকে ভাবতে বাধ্য করে।

তারপর নিজের ক্ষুদ্র প্রয়াসে একটি কাউন্সেলিং সেন্টার খোলেন ডা. মহলক্ষ্মী ওয়াই এন। তাঁর লক্ষ্য ছিল অ্যাসিড হামলায় আক্রান্ত মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মানসিক সাপোর্ট দেওয়া। যতদিন পর্যন্ত না কোনও মেয়ে সমস্ত ভয় কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে আবার আগের অবস্থায় ফেরে, ততদিন তার হাত ধরে থাকেন মহালক্ষ্মী। ক্রমে তাঁর কাজের কথা ছড়িয়ে পড়তে থাকল। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো। মহালক্ষ্মী অ্যাসিড আক্রান্ত মহিলাদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করেছেন। তাঁরা অন্যান্য আক্রান্ত নির্যাতিতাদের আইনি সহায়তা দিয়ে থাকেন। হোয়াইটফিল্ডের এক অ্যাসিড আক্রান্ত ১৯ বছরের অনন্তপ্রিয়া জানান, ''আমিও অ্যাসিড হামলার শিকার। আমার মুখের ৮০ শতাংশই ঝলসে গেছে। চিকিৎসাধীন থাকার সময় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুধু কাঁদতাম। বুঝতে পারতাম না কীভাবে এই ট্রমা থেকে বেরিয়ে আসব। তখন এক নার্সের কাছে মহালক্ষ্মী ম্যাডামের নাম শুনি। তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর নতুন করে বাঁচার তাগিদ অনুভব করেছি। উনি নিজে যেহেতু ভুক্তভোগী, তাই আমার যন্ত্রণাটা উনিই ভালো অনুভব করতেন।''

কাউন্সেলিং সেন্টার পরিচালনার পাশাপাশি চিকিৎসাক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মহালক্ষ্মী। তিনি এখন কর্ণাটক সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিষেবা বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার। প্রতিদিন ৬০-৮০ জন রোগী দেখেন। প্রথাগত চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁদের মানসিক স্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন। মহালক্ষ্মীর কথায়, ''আমার মুখে ২৫ টা সার্জারি হয়েছে। একটা সময় মনে হতো সুস্থজীবনে আর কোনওদিন হয়তো ফিরতে পারব না। মনে হতো আত্মহত্যা করি। কিন্তু আমার পরিবার আমায় সবসময় মনের জোর দিয়েছে। অনেক হতভাগ্য মেয়ের সেই অবলম্বনটুকুও নেই। তাদের জন্য আমি সবসময় কিছু করার চেষ্টা করি।''

সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ যখন নানা অছিলায় মেয়েদের জীবনটাকে নরক বানিয়ে দিতে তৎপর থাকে, তেমনই মহালক্ষ্মীর মতো সাহসিনীরাও আছেন যারা নিজেদের স্বল্প আয়াসে নিপীড়িতা, নির্যাতিতাদের বাঁচার অবলম্বন ও ভরসা হয়ে ওঠেন। তাঁদের উত্তরণের দিশা দেখান। □

বৃদ্ধ দশা

বহুদিন আগে বারাণসীতে দৃঢ়বর্মা নামে একজন রাজা ছিলেন। আর বোধিসত্ত্ব ছিলেন সেই রাজার মহামন্ত্রী। রাজার বাড়িতে কাজের জন্য একটি

সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান উট ছিল। উটটি আবার দারুণ শক্তিশালী ও কর্মঠ ছিল। প্রয়োজনে উটটি রাজার চিঠি বয়ে নিয়ে যেত অন্য রাজ্যে। একবার যুদ্ধের সময় উটটি শত্রুশিবিরে ঢুকে গিয়ে তাদের প্রচুর ক্ষতি করে শত্রুপক্ষকে একেবাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই উটটিকে রাজা খুব ভালোবাসতেন। আদরযত্ন করতেন, ভালো ভালো খাওয়াতেন। সে বেশ আনন্দের দিন ছিল।

এইভাবে দিন যায়। উটের বয়স বাড়তে থাকে। এক সময় উটটি বুড়ো হয়ে যায়। এখন সে আর আগের মতো খাটতে পারে না। রাজাও তাকে আর আগের মতো আদরযত্ন করেন না। ক্রমে রাজা উটটিকে ভুলে গেলেন। উটের দুর্দিন শুরু হলো। মনের দুঃখে সে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গলেই পড়ে থাকে।

একসময় রাজবাড়িতে মাটির বাসনের খুব অভাব দেখা দিল। মহামন্ত্রী কুমোরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, মাটির বাসন দিচ্ছ না কেন?

কুমোর বলল, মহামন্ত্রী, গোবর পাওয়া যাচ্ছে না। গোবর আনার জন্য বহুদূর যেতে হয়।

তবে যাও না কেন?

অতদূরে যাওয়ার মতো বলদ নেই।'

মহামন্ত্রী রাজামশাইকে সব বললেন। রাজার তখন উটের কথা মনে পড়ে গেল। জঙ্গল থেকে উটটিকে ধরে এনে কুমোরকে দিয়ে দেবার জন্য আদেশ দিলেন। কুমোর উটটিকে মাটি বয়ে আনার কাজে লাগাল। উটের বয়স হয়েছিল। আগের মতো পরিশ্রম করতে পারে না। খুব কষ্ট হয়। গরিব কুমোরও তাকে পেটভরে খেতে দিতে পারে না। একদিন মাটি বয়ে আনার সময় উটের সঙ্গে মহামাত্য বোধিসত্ত্বের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উটটি বোধিসত্ত্বকে তার দুঃখের কথা খুলে বলল এবং এর প্রতিকার চাইল। বোধিসত্ত্বকে এটাও মনে করিয়ে দিল যে যখন তার বয়স কম ছিল তখন সে রাজামশাইয়ের কতই না সেবা করেছে। অথচ সে যখন বুড়ো হয়ে গেল, রাজামশাই তাকে ভুলে গেলেন।

তার পরদিন বোধিসত্ত্ব রাজসভায় গিয়ে রাজাকে বললেন, আপনার উটটি কোথায়? রাজা বললেন, সেটি বুড়ো হয়ে গেছে, ভালোভাবে কাজ করতে পারে না, তাই কুমোরকে দান করা হয়েছে। বোধিসত্ত্ব তখন উটের কাছে শোনা কথাগুলো আর আগেকার ঘটনাগুলি সব রাজাকে খুলে বললেন এবং উটটিকে ঠিকমতো যত্ন করা হচ্ছে না তাও জানালেন।

রাজা চিন্তাভাবনা করে বোধিসত্ত্বকে বললেন, উটটিকে আবার রাজবাড়িতে নিয়ে আসা হোক এবং যতদিন বেঁচে থাকবে বিনা পরিশ্রমে আগের মতোই আদরযত্নে রাখা হোক।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

শান্তি ঘোষ

বিপ্লবী শান্তি ঘোষের জন্ম ১৯১৬ সালের ২২ নভেম্বর। তাঁর পিতৃভূমি বরিশাল। বড়ো হয়েছেন কুমিল্লায়। তাঁকে বিপ্লবের পথে উদ্বুদ্ধ করেন তাঁরই এক সহপাঠী। ১৯৩১ সালে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলি করে মারার কারণে জেলে যান। জেলে তাঁকে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। জেল থেকে মুক্তির পর পড়াশোনা করে তিনি ম্যাট্রিক ও আইএ পাশ করেন। ১৯৪২ সালে চট্টগ্রামের চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৬২ থেকে ৬৭ সাল তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্য এবং ১৯৫২-৬২ ও ১৯৬৭-৬৮ সালে রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। পরে তিনি সাহিত্য সাধনা ও জনসেবা করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। ১৯৮৯ সালের ২৭ মার্চ তিনি পরলোকগমন করেন।

জানো কি?

- মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করেন।
- বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন।
- সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে কাজি নজরুল 'কাণ্ডারি হুঁশিয়ার' কবিতা লিখেছিলেন।
- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু হয় ট্রাম দুর্ঘটনায়।
- গিরীশ চন্দ্র ঘোষ 'সেবক' ছদ্মনামে নাটক লিখেছেন।

ভালো কথা

দিদার হলুদ

সোনাইয়ের দিদা আমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসে। উনি আমাদের পাড়ার সবার দিদা। শীতকাল এলেই দিদা সকালবেলা সবাইকে ডেকে ডেকে কাঁচা হলুদ আর একটুখানি গুড় খেতে দেয়। বলে, এটা খেলে রক্ত ভালো থাকবে আর অসুখবিসুখ কম হবে। আমি আর আমার বোন অতকিছু বুঝি না। হলুদ খেতে ভালো লাগে না কিন্তু গুড় খাওয়ার লোভে হলুদটুকু খেয়ে নিই। শীতের দুমাস সোনাইদের বাড়িতে সকালে তাই খুব ভিড় থাকে। কিন্তু ফাল্গুন মাস পড়লেই ভিড় ফাঁকা। শুধু একটু বড়ো যারা, তারাই আসে। ওই দুমাস দিদা নিমপাতার রস খাওয়ায়। ছোটোরা কেউ আসে না। আমি আর বোন মায়ের বকা খাওয়ার ভয়ে চোখ বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে সবটা খেয়ে নিই। নিমপাতার রস খাওয়ার ভয়ে সোনাই কিন্তু বাথরুমে লুকিয়ে থাকে

সৌরভ মহান্তি, সপ্তম শ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) বা রা রি	(১) স্তা ন্ত হ র গ্য যো
(২) বা বে র	(২) বা ং হ হি স নী

২ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) কৌতূহল (২) আস্ফালন

২ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) সন্তানসম্ভবা (২) সমপরিমাণ

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) সুকর্ণা দেব, দুর্গাবাড়িপাড়া, গঙ্গারামপুর, দঃ দিঃ। (৩) আদিত্য চৌধুরী, রাজনগর, কালিয়াচক, মালদা। (৪) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

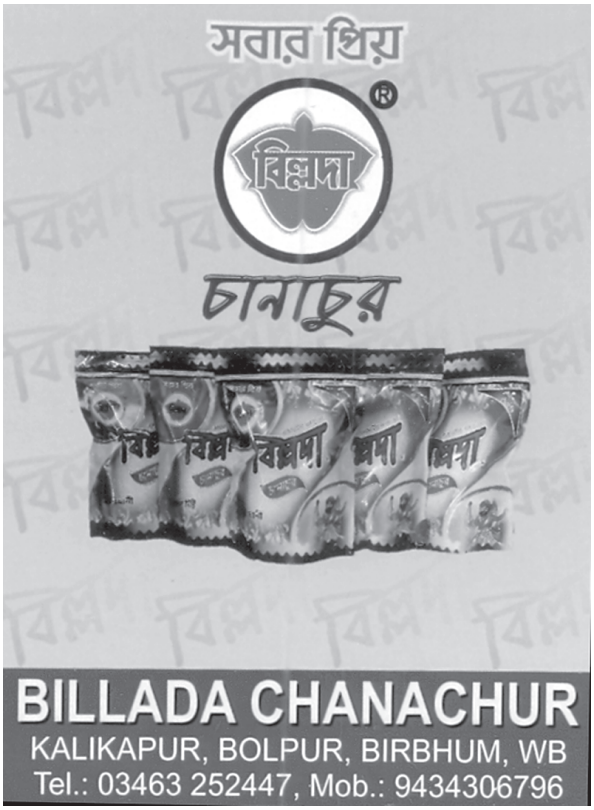

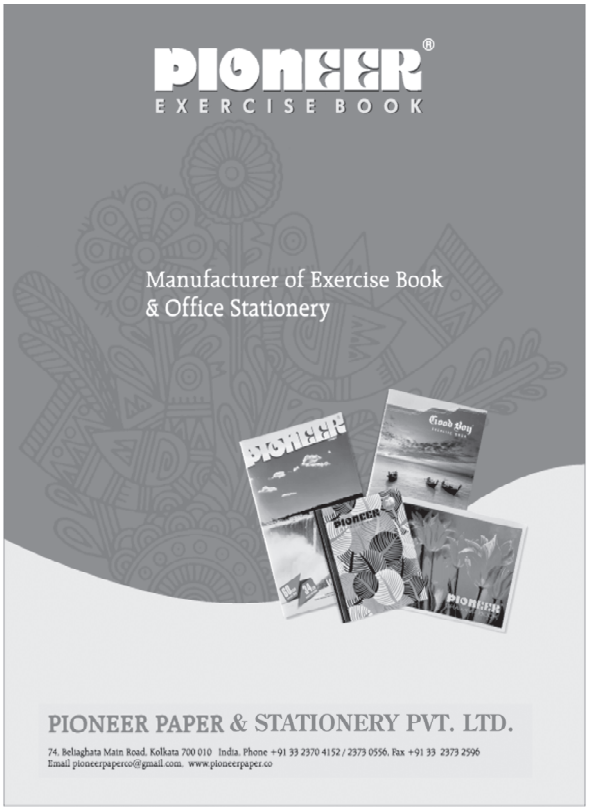

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

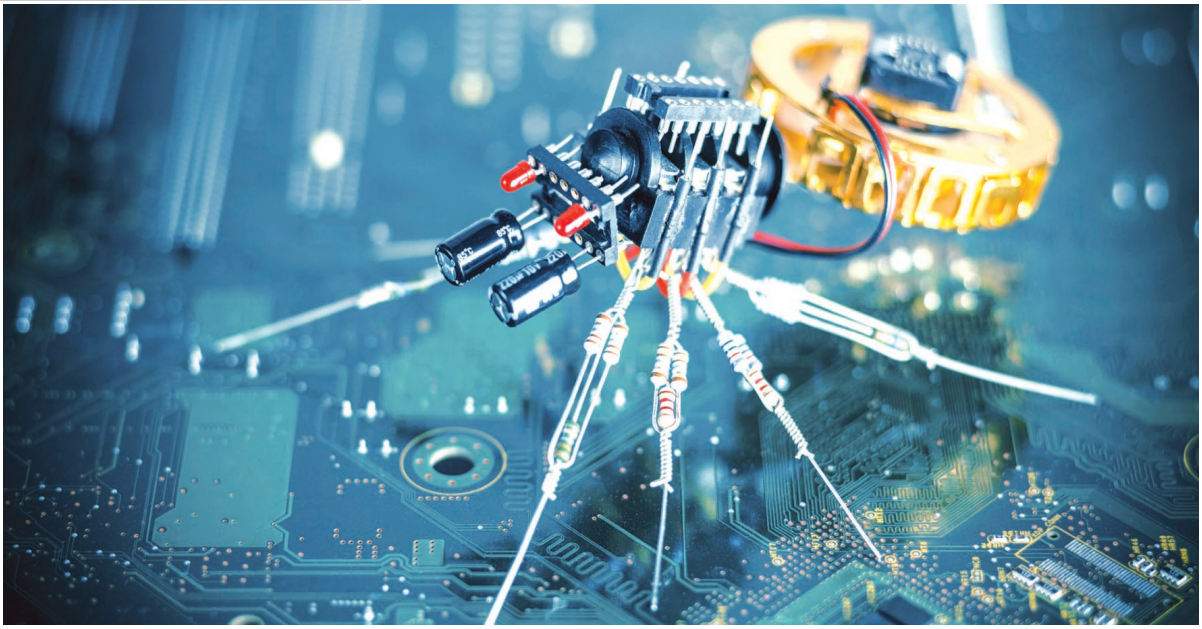

ন্যানোবটে চড়ে অমরত্বের সন্ধানে

ড. ধনঞ্জয় রায়

ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো 'আত্মানং বিদ্ধি'— তুমি নিজের আত্মাকে আগে জানো— তুমি কোথা থেকে এসেছ, কে তোমায় সৃষ্টি করেছেন। একনিষ্ঠ ভাবে আমরা যদি এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকি তাহলে একসময় ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছে যাব, ঈশ্বরের অপূর্বরূপ দেখতে পাবো, আমরা পুনর্জন্ম নেওয়ার হাত থেকে রেহাই পাব, আমরা 'অমরত্ব' লাভ করব। বর্তমান বিজ্ঞানীরাও এই ধর্মশিক্ষায় অনুপ্রাণীত হয়ে শুধু মানুষ নয়, সমগ্র বস্তুজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব খুঁজতে আজ প্রাণপাত করে চলেছেন। ফলও আসতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ফল দেখে অনুমান করা যায় যে মানুষকে অমরত্বের দোরগড়ায় পৌঁছে দেওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ভাবছেন আমি হেঁয়ালি করছি! না, হেঁয়ালি নয়। আমি নতুন এক বিজ্ঞানের কথা বলছি— নাম তার 'ন্যানো বিজ্ঞান।' এখন দেখে নেওয়া যাক্ এই 'ন্যানো' বিষয়টা কী! এটি একটি দৈর্ঘ্য মাপের একক। ১ মিটার দৈর্ঘ্যকে ১০০ কোটি ভাগে ভাগ করলে তার এক একটি ভাগের দৈর্ঘ্য হবে ১ ন্যানো মিটার। সংখ্যায় প্রকাশ করলে হবে 10^{-9} nm। এই ক্ষুদ্র অংশকে মানুষ খালি চোখে দেখতে পায় না। মানুষের চোখ কেবলমাত্র ১ মিটারের দশ হাজার ভাগের ১ ভাগকে দেখতে পায়, যা সংখ্যায় দাঁড়াবে 10^{-4} মিটার। বিজ্ঞানের যে শাখায় ন্যানো মাপের বস্তুর গুণ, ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করা হয় তাকে বলে ন্যানো-বিজ্ঞান এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যানো কণা দিয়ে বস্তু বা যন্ত্র তৈরির পদ্ধতিকে বলা হয় ন্যানো-টেকনোলজি।

একটু যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, পাথর বা টাইলসের বড়ো বড়ো টুকরো দিয়ে মানুষ বা পশুপাখির অবয়ব আঁকা সহজ নয়, কিন্তু ছোটো ছোটো টুকরো দিয়ে অবয়ব ফুটিয়ে তোলা অনেক সহজ। টুকরো যতই সূক্ষ্ম হবে, অবয়ব ততই স্পষ্ট হবে। আমাদের আগেকার সময়ে টিভি, রেডিয়ো, ঘড়ি, কম্পিউটার প্রভৃতি ইলেকট্রনিক্সের জিনিসপত্র বড়ো বড়ো আকারের হতো। কারণ গঠনকারী বস্তু বা উপাদনগুলিও সাইজে বড়ো থাকত। কিন্তু আজকালকার দিনে ওই জিনিসগুলোই কত ছোটো সাইজের হয়ে গেছে। তার কারণ, উপাদান বস্তুকণাগুলিকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ উপাদান কণাগুলো যত ক্ষুদ্র হবে, তা দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র আকারে ছোটো হবে। শুধু তাই নয়, গুণগত মানও উন্নত হবে অথবা ভিন্ন হবে।

আধুনিক বিজ্ঞানে যে অগ্রগতি আমরা দেখছি সেখানে বিভিন্ন রকম মহাকাশ অভিযান হচ্ছে। হাজার কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুর উপর নিখুঁত ভাবে রকেট হানা দেওয়া যাচ্ছে। বিশাল বিশাল আকৃতির কম্পিউটারের জায়গা নিচ্ছে ছোটো ছোটো আকারের ল্যাপটপ বা হাতের তালুর মাপের ট্যাব। কাঠকয়লার পরিবর্তে মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে নিমেষে রান্না করা যাচ্ছে। সর্বোপরি চিকিৎসা বিজ্ঞানে ক্লেশমুক্ত এবং প্রায় রক্তপাতহীন মাইক্রোসার্জারির বিস্তার ঘটছে— এ সমস্ত কিছু সম্ভব হচ্ছে মাইক্রো-টেক্‌নোলজির হাত ধরে। তাই এই সময়টাকে বলা হয় মাইক্রো-যুগ। মাইক্রোটেকনোলজির প্রধান হাতিয়ার হলো— মাইক্রোকণা, যার আকার হলো 10^{-6} মিটার। এখন যদি উপাদান কণার আকার আরও এক হাজারগুণ ছোটো হয়ে ন্যানো-কণায় অর্থাৎ 10^{-9} মিটার হয় তাহলে তো স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে এবং টেক্‌নোলজির

প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে একটা নতুনত্ব বা অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটবে। ঠিক তাই, ন্যানো কণার প্রযুক্তিতে আমরা কিছু অজানা, অদেখা, কাল্পনিক বৈশিষ্টের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। ইতিমধ্যে কিছু কিছু ইঙ্গিতও মিলেছে। বিষয়টা হলো, একই পদার্থদিয়ে তৈরি বিভিন্ন আকারের কণার ধর্ম হুবহু একই রকম হয় না। ছোটো ছোটো কণার সমন্বয়ে যখন বড়ো কণার সৃষ্টি হয় তখন ছোটো কণার সব ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বড়ো কণার মধ্যে দেখা যায় না, চাপা থাকে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কচি বাঁশ বেশ নরম হয়, তাকে যেমন খুশিভাবে বাঁকানো যায়। এখন একই রকমের দুটি কচি বাঁশকে একসঙ্গে বেঁধে বান্ডিল করলে ওই বান্ডিলকে আর তত সহজে যেমন তেমন ভাবে বাঁকানো যাবে না। এখন একই রকমের ৫-১০ টি কচি বাঁশকে বেঁধে বান্ডিল করলে ওই বান্ডিলে কোনোরূপ নমনীয়তা থাকবে না, উলটে দৃঢ়তা প্রকাশ পাবে। এখন যদি আমরা মেনে নিই যে ১ হাজার ন্যানো কণার সমষ্টিতে হয় একটি মাইক্রো কণা, তাহলেই তো সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে ন্যানো-কণার মধ্যে অভিনবত্ব থাকবে। বর্তমান মাইক্রো-বিজ্ঞান প্রযুক্তিও বিজ্ঞানকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছে, ন্যানো বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগে অদূর ভবিষ্যতে আমরা কল্পবিজ্ঞানকে বাস্তবের মাটিতে ঘটতে দেখব, সেটা আশা করা যেতেই পারে।

এখন দেখে নেওয়া যাক বিজ্ঞানে ন্যানোর বর্তমান অবস্থান ও প্রয়োগ :

মেডিসিন : পিঁপড়ের সারি থেকে একটি পিঁপড়েকে মারতে

চাইলে পিঁপড়ের সাইজের ছোটো পাথরের টুকরো হলে ভালো, টুকরো যত বড়ো হবে বেশি পিঁপড়ে মারা যাবে। আমাদের শরীরে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া হলো ন্যানো সাইজের জীব, আমাদের দেহকোষও ন্যানো সাইজের থেকে সামান্য বড়ো। শরীরে যখন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ঢোকে এবং দেহকোষকে আক্রান্ত করে, প্রথমে তো একটা -দুটো কোষ আক্রান্ত হয়। রোগকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে হলে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলিকে এবং ভাইরাস ব্যাকটোরিয়াকে মেরে ফেলতে হবে। তাই তার জন্য প্রয়োজন এদের সাইজের কণা-মেডিসিন বা ন্যানো মেডিসিন। ন্যানো মেডিসিন পারবে আমাদের শরীরে রক্ত বা রক্তরসের মধ্য দিয়ে কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন না হয়ে অনায়াসে প্রতিটি কোষে খুব দ্রুত পৌঁছে যেতে এবং বেছে বেছে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত কোষ খুঁজে মেরে ফেলতে। বর্তমানে যে মেডিসিন ব্যবহৃত হচ্ছে তা ন্যানোর থেকে বহুগুণ বড়ো। ফলে তাদের পক্ষে একক কোষ বা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তারা আক্রান্ত কোষের সঙ্গে অনেক সুস্থ কোষকেও নষ্ট করছে। ফলে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অন্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এসে যায়। এটাই ওষুধের সাইড-এফেক্ট বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। উপরের আলোচনা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে ন্যানো মেডিসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম হবে বা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে ক্যানসার, টিউমার এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষত নিরাময়ের ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। চোখের রেটিনার চিকিৎসায় অন্ধচোখে আলো ফেরানো সম্ভব হয়েছে।

অপারেশন : কল্পবিজ্ঞানে রোবট বা যন্ত্রদানবের কথা আমরা অনেকে জেনেছি। বর্তমানে Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে অফিসে, ঘরের বৈঠকখানায়, রান্নাঘরে, হোটেলে, এমনকী অপারেশন থিয়েটারে, নানান ছোটোখাটো পরিবহণের কাজে, পরিবেশনার কাজে লাগানো হচ্ছে রোবটকে। যে প্রযুক্তির সাহায্যে এই সকল কাজকর্ম করা যাচ্ছে তা হলো মাইক্রো-পদ্ধতি বা প্রযুক্তি। মাইক্রো-প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে রোগীকে কম কষ্ট দিয়ে, প্রায় রক্তপাতশূন্য ভাবে মাইক্রো-সার্জারির বহুল ব্যবহার শুরু হয়েছে। এখন গবেষণা চলছে কীভাবে মাইক্রোর জায়গায় ন্যানোর দখলদারী আনা যায়। পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে— ন্যানো যেহেতু তার ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য শরীরের ভেতরে যে কোনো অংশের ভেতর দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারে, বর্তমানের বিশালাকার রোবটের পরিবর্তে ক্ষুদ্র আকারের ন্যানোবট আবিষ্কার করে শরীরের রক্তের মাধ্যমে শরীরের প্রতিটি কোণায় কোণায় পাঠানো এবং সর্বক্ষণ অতন্দ্র প্রহরায় কাজ করানোর। শরীর যখন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হবে, শরীরের কোনো কোষ আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। ন্যানোবট তৎক্ষণাৎ খুঁজে খুঁজে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত কোষকে শরীরের বাইরে বের করে দেবে। শরীর অসুস্থতা বুঝে ওঠার আগেই রোগজীবাণু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। একে বলা হচ্ছে 'ন্যানোবট সার্জারি'। কোনো জ্বালাযন্ত্রণা থাকবে না, কোনো রক্তপাত হবে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী বিপ্লব আসতে চলেছে।

ইলেকট্রনিক্স/মোবাইল : মাইক্রো-টেকনোলজির হাত ধরে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর আকার ও ওজন দুই ভীষণভাবে কমে গেছে। এক সময়ের বিশাল বিশাল আকারের টেবিল-টপ কম্পিউটার, নানান মেসিন আকারে ক্ষুদ্র ও অনেক হালকা ওজনের হয়েছে। ল্যাপটপ ও ট্যাব হলো উদাহরণ। ন্যানো-টেকনোলজির সার্থক প্রয়োগে এইসব ল্যাপটপ, মোবাইল হবে আকারে আরও ক্ষুদ্র এবং ভীষণ নমনীয়। ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল হ্যান্ডসেটগুলিকে ট্রান্সপারেন্ট ভাবে তৈরি করার এবং এমনসব ন্যানো-ডিভাইস ব্যবহার করার যাকে ইচ্ছেমতো অ্যাক্টিভেট করে মানুষের চোখে অদৃশ্য করে রাখা যায়। এই রকম মোবাইলকে সহজে সূর্যরশ্মি দিয়ে চার্জ করা যাবে। এরা বাতাসে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতির নির্দেশ করবে। রোগ প্রতিরোধে অনেক সহায়তা হবে।

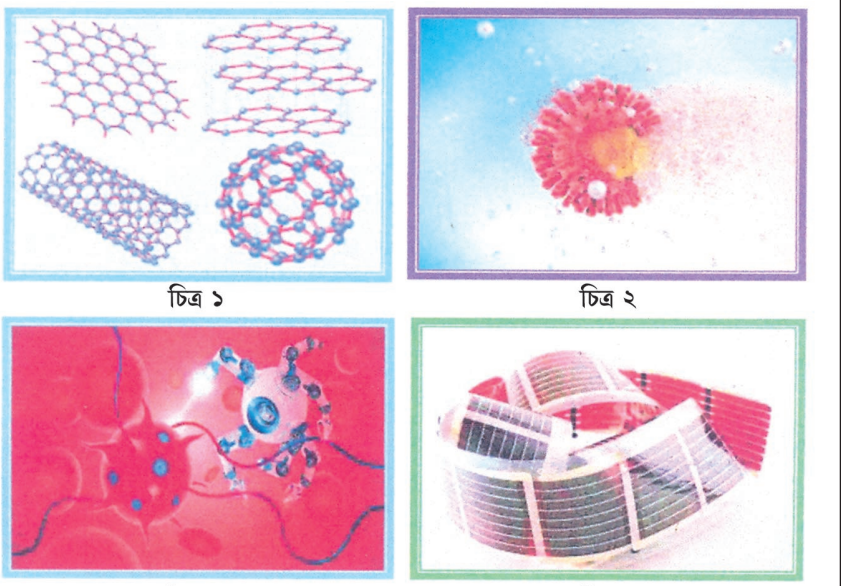

চিত্র ১ চিত্র ২

চিত্র ৩ চিত্র ৪

(১) মাত্র কয়েকটি পরমাণুর সমষ্টি— ন্যানো (২) ন্যানো মেডিসিন কণা আক্রান্ত কোষকে ঘিরে নষ্ট করছে (৩) ন্যানোবট্ আক্রান্ত কোচকে ধ্বংস করছে (৪) নমনীয় সোলার সেল।

সোলার সেল : ভবিষ্যৎ বিশ্বের কাছে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ ক্রমশ এগিয়ে আসছে তা হলো বিদ্যুৎহীন জীবনযাপন। বিদ্যুৎ তৈরির প্রচলিত কাঁচামাল কয়লা ও তেল-দুটোরই সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছে। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত কাঁচামাল দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরিতে প্রচুর বায়ু দুষণকারী উপাদানের সৃষ্টি হয়, যার কারণে জীবকুলের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে, এমনকী প্রাণহানির কারণ হচ্ছে। দূষণমুক্ত ভাবে অফুরন্ত শক্তির উৎস সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ তৈরির ক্ষেত্রে সোলার সেলের ভূমিকার উল্লেখ করা যেতে পারে। ন্যানো টেক্‌নোলজিতে তৈরি সোলার সেলের কার্যক্ষমতা, স্থায়িত্ব ও নমনীয়তা বর্তমানের সোলার সেলের থেকে অনেক গুণ বেশি হবে। তাই ন্যানো সোলার সেল হয়তো ভবিষ্যতের বিদ্যুৎশক্তি সংকট সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

অমরত্ব : যথার্থ পুষ্টির অভাবে দেহকোষগুলি অবসন্ন, দুর্বল, ক্লান্ত হয়ে জীবাণুর আক্রমণে রোগগ্রস্ত হয়ে ক্রমশ কর্মক্ষমতা হারিয়ে মৃত্যুমুখী হয়। যদি যথা সময়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি প্রতিটি কোষে সরবরাহ করা যায় তাহলে অপুষ্টিজনিত ক্ষয় থেকে কোষগুলিকে রক্ষা করা যেত, তাহলে কোষের মৃত্যু ঘটত না। দ্বিতীয়ত, দেহে প্রবেশকারী রোগ জীবাণুগুলিকে যদি চিহ্নিত করে দ্রুত মেরে ফেলা যায় বা আক্রান্ত কোষগুলির বড়ো আকারে রোগ ছড়িয়ে পড়ার আগে দেহের বাইরে বার করে দেওয়া যায় তাহলে বিজ্ঞানীদের ধারণা মানুষ আরও দীর্ঘায়ু হতে পারবে। ন্যানো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতিতে বিজ্ঞানীরা আশার আলো দেখছেন যে ন্যানো-নিউট্রিয়েন্টস অতি দ্রুততায় প্রতিটি কোষে পৌঁছে যাবে এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগান দিয়ে কোষকে সক্রিয় ও সতেজ রাখবে। বিজ্ঞানীদের আশা, আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে ন্যানো সাইজের মেশিন আবিষ্কার করা সম্ভব হবে যা শরীরের রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে দেহের প্রতিটি কোণায় কোণায় পৌঁছে সমস্ত কোষের উপর নজরদারি করবে এবং প্রয়োজন মতো স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোগাক্রান্ত কোষকে অপারেশন করে শরীরের বাইরে বার করে দিয়ে রোগ জীবাণু ধ্বংস করে ফেলবে। এও জানা যাচ্ছে ন্যানো-প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্রেনকোষের রিপেয়ারিং, রিফ্রেশমেন্ট করা সম্ভব হবে। ন্যানো প্রযুক্তির দ্বারা মেমোরি সেলের ব্যাকআপ নেওয়া সম্ভব হবে। ফলে বার্ধক্যজনিত স্মৃতিভ্রংশ হবে না, স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। ন্যানোবট আমাদের মৃত্যুর কারণগুলিকে সাফ করে দেবে। মানুষ দীর্ঘকাল সুস্থ, সতেজ ও পরিপূর্ণ স্মৃতিশক্তি নিয়ে বেঁচে থাকবে— এটাই তো 'অমরত্ব'। ন্যানো কণাই সৃষ্টি কণা— 'ঈশ্বর কণা'।

পরিশেষে বলি, ন্যানো প্রযুক্তি সম্পূর্ণ ও সার্থকভাবে বাস্তবায়িত হলে মানুষের জীবনযাত্রা, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে একটি আমূল পরিবর্তন আসবে ঠিকই, তবে আমাদের সচেতনভাবে মনে রাখতে হবে— প্রত্যেক সাফল্যেরও একটি অন্ধকার দিক থাকে। ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিমেষে গোটা পৃথিবীর জীবকুলকে ধ্বংস করে দেওয়া যাবে, আরও অনেক সহজে অপরাধ সংগঠিত করা যাবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রত্যেকের 'প্রাইভেসি' ভীষণভাবে বিঘ্নিত হবে। তবুও আসুন, আমরা সবাই আশাবাদী হই এবং মোহময়ী জাদুকরি ন্যানো যুগকে আহ্বান করি। □

মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশ গণহত্যা বিলের ভবিষ্যৎ কী?

শিতাংশু গুহ

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে পাকিস্তানি গণহত্যার বিষয়টি মার্কিন কংগ্রেসে বিল হিসেবে পেশ হয়েছে ১৪ অক্টোবর ২০২২। বিলটি তুলেছিলেন দু'জন কংগ্রেসম্যান স্টিভ শ্যাবট ও রোহিত খান্না। বিলের নাম, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ গণহত্যার স্বীকৃতি'। প্রস্তাবনার নম্বর, 'কংগ্রেসীয় প্রস্তাব এইচ আর ১৪৩০'। রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান স্টিভ শ্যাবট ও ডেমোক্রেট কংগ্রেসম্যান রোহিত খান্না যৌথ উদ্যোগে হাউস অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদে এই বিল উত্থাপন করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার ৫১ বছর পর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি মহৎ কর্ম সম্পন্ন হলো।

একই দিন, অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর স্টিভ শ্যাবট এক টুইট বার্তায় লিখেছেন : 'বাংলাদেশে ১৯৭১-র গণহত্যা ভুলে যাওয়া যায় না। আমার নির্বাচনী এলাকার (ওহাইও ডিস্ট্রিক্ট-১) হিন্দুদের সমর্থনে, কংগ্রেসম্যান রোহিত খান্না এবং আমি বাঙ্গালি এবং বিশেষত, হিন্দুদের ওপর যে ব্যাপক নির্যাতন ও নৃশংসতা, যা মূলত একটি 'গণহত্যা' সেটির স্বীকৃতির জন্যে কংগ্রেসে একটি আইনানুগ প্রস্তাব (বিল) উত্থাপন করেছি'। স্টিভ শ্যাবট ২০১১ থেকে কংগ্রেসম্যান এবং আগেও তিনি ১৯৯৫-২০০৯ পর্যন্ত ওহাইও ডিস্ট্রিক্ট-১'র প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রোহিত খান্না ২০১৭ থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার ১৭তম ডিস্ট্রিক্ট প্রতিনিধিত্ব করছেন।

অন্য এক টুইটে স্টিভ শ্যাবট লিখেছেন, 'গণহত্যার শিকার লাখো মানুষের স্মৃতি বছরের পর বছর ভুলে থাকা যায় না। এই গণহত্যার স্বীকৃতি ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে এবং অমেরিকানদের সচেতন ও শিক্ষিত করে তুলবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ অপরাধীরা বার্তা পাবে যে, এমনতর অপরাধের কথা মানুষ ভুলে যাবে না এবং তা সহ্যও করবে না'। ডেমোক্রেট কংগ্রেসম্যান রোহিত খান্না এক টুইটে বলেছেন, 'এই প্রথম উত্থাপিত এই প্রস্তাবে স্টিভ শ্যাবটের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি গর্বিত।' তিনি বলেন, আমাদের সময়ে ভুলে যাওয়া এ গণহত্যায় লাখো বাঙ্গালি ও হিন্দু নিহত বা বাস্তুচ্যুত হয়েছিল।

এই প্রস্তাব উত্থাপনের নেপথ্যে এইচআরসিবিএম অর্থাৎ হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস মাইনরিটিজ। সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক প্রিয়া সাহা এনিয়ে একটি প্রেস-রিলিজ দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে বাংলাদেশ গণহত্যার স্বীকৃতি প্রস্তাব এইচআর ১৪৩০-এ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং ইসলামি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ৯ মাসে তদানীন্তন পূর্ব- পাকিস্তানে হিন্দু ও সেকুলার গ্রুপকে টার্গেট করা হয়েছিল। স্টিভ শ্যাবট কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাসের ভাইস-চেয়ার এবং ফরেন রিলেশনস কমিটির এশিয়া ও প্যাসিফিক সাব-কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী স্টিভ শ্যাবট বিল উত্থাপন করে বলেছেন, ১৯৭১ সালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের ৮০ শতাংশ হিন্দু। এবং আমার মতে এটি অন্য যে কোনো গণহত্যা বা 'হলোকাস্ট'-র মতো এটিও একটি 'জেনোসাইড'। অথচ এটি গণহত্যা হিসাবে ঘোষিত বা স্বীকৃত নয় এবং আমরা এখন এনিয়ে কাজ করছি। এতে বলা হয়, ত্রিশটি জাতীয় হিন্দু সংগঠন এবং স্থানীয় পর্যায়ে অনেকে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় দুই কংগ্রেসম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

৮ পাতার '১৯৭১ বাংলাদেশ গণহত্যা স্বীকৃতি' প্রস্তাবে ঘটনা স্বীকার করে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের কাছে পাকিস্তানকে ক্ষমা চাওয়া এবং অপরাধী যাঁরা এখনো জীবিত তাঁদের আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে ১৯৭৯ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঙ্গালি ও হিন্দুদের ওপর নৃশংসতাকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয় এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে 'গণহত্যা' ও 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কিন কংগ্রেসে দেড় লক্ষ আর্মেনিয়ান গণহত্যার (২০১৫) স্বীকৃতি পায় ২৯ অক্টোবর ১০১৯। ১২ই ডিসেম্বর ২০১৯ সিনেটে তা সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেসম্যান অ্যাডাম শিফ ৮ এপ্রিল ২০১৯-এ বিলটি (এইচআর ২৯৬) উত্থাপন করেন। এর আগে বেশ কয়েকবার বিল এলেও তা আলোর মুখ দেখেনি। ২২ এপ্রিল ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান সর্বপ্রথম হলোকাস্ট প্রসঙ্গে আর্মেনিয়ান জেনোসাইডের কথা বলেছিলেন। জানা যায় ১৮৯৫-৯৬ সালে অটোম্যান সৈন্যরা এবং তাঁদের লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডাবাহিনী প্রায় ১ লক্ষ আর্মেনিয়ানকে হত্যা করে এবং গ্রামকে গ্রাম জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। ২৪ এপ্রিল ২০২১-এ আর্মেনিয়ান গণহত্যা স্মরণ দিবসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসে এক বিবৃতিতে 'গণহত্যা'র কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ গণহত্যা বিল এইচআর ৪৩০-র ভবিষ্যৎ কী? □

জঙ্গিদের সন্ধান দেবে 'সাইবর্গ' ইঁদুর

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ দীর্ঘকাল ধরেই পুলিশ থেকে সেনা, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কুকুরের ব্যবহার চলে আসছে। এবার সেই কাজে লাগানো হবে বিশেষ ধরনের ইঁদুরকে। শত্রুপক্ষের অজান্তে তাদের নানা অ্যাক্টিভিটির ভিডিয়ো ফিড পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারে ইঁদুর। সেই ভাবনাচিন্তা থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে ল্যাবেরটরিত 'র‍্যাট সাইবর্গ' বা 'ইঁদুর সাইবর্গ' তৈরি করছেন ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানীরা।

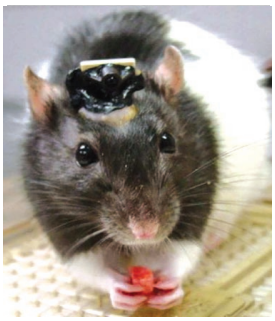

'সাইবর্গ' কথাটির অর্থ এমন এক ব্যক্তি যার শরীরে যান্ত্রিক উপাদান প্রবেশ করিয়ে শরীরের ক্ষমতা স্বাভাবিকের থেকে বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কখনও কখনও তার মস্তিষ্কে বিশেষ সফ্টওয়্যার বসিয়ে দিয়ে রিমোট সেন্সিঙের মাধ্যমে ইচ্ছেমতো তাকে পরিচালনা করা যায়। 'র‍্যাট সাইবর্গ' আদতে স্বাভাবিক ইঁদুর। তবে তাদের মস্তিষ্কে একধরনের ইলেক্ট্রোড স্থাপন করেছেন বিজ্ঞানীরা। ওই ইলেক্ট্রোডের মাধ্যমে ইঁদুরটি বাইরে থেকে পাঠানো সংকেত গ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ দূরে বসেই বিজ্ঞানীরা তাকে যেমন কম্যান্ড পাঠাবে ইঁদুরটি সেভাবেই কাজ করবে। শুধু তাই নয়, লাইভ ভিডিয়ো রেকর্ডিঙের জন্য ইঁদুরগুলির পিছনে উন্নত প্রযুক্তির ক্যামেরা বেঁধে দেওয়া হবে।

হায়দরাবাদের ডিআরডিও ইয়ং সায়েন্টিস্ট ল্যাবেরটরির একঝাঁক তরুণ বিজ্ঞানী এই ইঁদুরগুলিকে অভিনব উপায়ে তৈরি করেছেন। ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের ১০৮ তম অধিবেশনে ডিরেক্টর পি শিবপ্রসাদ বলেন, ''আমাদের উদ্দেশ্য হলো সেমি-ইনভেসিভ ব্রেন ইলেক্ট্রোডের মাধ্যমে ইঁদুরের মস্তিষ্কে ইলেকট্রনিক কম্যান্ড পাঠিয়ে কৌশলে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে লেজার ট্রান্স রিসিভার-সহ একটি ছোট পিসিবি খুলির উপর লাগিয়ে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে ইঁদুরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা।''

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে র‍্যাট সাইবর্গের মাধ্যমে একদিকে যেমন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে আগাম খবর পাওয়া যাবে তেমনি ২৬/১১ হামলার মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। আগামীদিনে এই ইঁদুর সাইবর্গ ব্যবহার করে জঙ্গি দমনে বড়ো সাফল্য পাবে ভারত সে বিষয়ে আশাবাদী প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানীরা।

পেনশন স্কিমে ৯ লক্ষ কোটির লগ্নি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ চলতি অর্থবর্ষের শেষে ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের (এনপিএস) আওতায় গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ৯ লক্ষ কোটি টাকা হবে বলে আশা করছে নিয়ামক সংস্থা পেনশন ফান্ড রেগুলেটারি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (পিএফআরডিএ)। ২০২২ ক্যালেন্ডার বর্ষে এই প্রকল্প খাতে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ২২ শতাংশ বেড়ে ৮.৫ লক্ষ কোটি হয়েছে। কর্পোরেট সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের এই প্রকল্পে যোগ দেওয়ার সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়লেও দেশের সংস্থাগুলির তরফে এখনও সেরকম সাড়া পাওয়া যায়নি। মোট ১২ হাজার সংস্থার মধ্যে ৪ শতাংশ সংস্থা এই প্রকল্পে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যোগ দিয়েছে, তবে অন্যান্য সংস্থাগুলিও প্রকল্পে যোগদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নতুন গচ্ছিত আমানতের মধ্যে পিএফআরডিএ প্রায় ১,১০০ কোটি টাকা রিট এবং ইনফিটে বিনিয়োগ করেছে। যার ফলে অন্য ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি রিটার্ন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে নিয়ামক সংস্থা। বর্তমানে নিয়ামক সংস্থাটির ১৭ শতাংশ আমানত শেয়ারে, ৫১ শতাংশ সরকারি সংস্থার শেয়ারে এবং ২৭ শতাংশ কর্পোরেট বন্ডে রয়েছে। বাকি আমানত অন্যান্য বিনিয়োগ উপকরণে ডিপোজিট করা হয়েছে।

NATIONAL PENSION SCHEME(NPS)

তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়লো ভারতে

বিশেষ সংবাদদাতা ॥ কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রকের মাসিক পরিসংখ্যান রিপোর্ট অনুসারে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে তাপবিদ্যুৎ ও সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদন, দুটোই তার আগের বছরের ডিসেম্বরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫.০৩ শতাংশ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত মাসে মোট ৯৮,৪৪৩ মিলিয়ন ইউনিট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে উৎপাদিত হয়েছিল ৮৫,৫৭৯ মিলিয়ন ইউনিট তাপবিদ্যুৎ।

ভারতে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় ২৫ শতাংশ সরবরাহ করে এনটিপিসি। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থাটি এর আগেই জানিয়েছে, ভারতে বিদ্যুৎ সরবরাহের মূল ভিত্তি হলো তাপবিদ্যুৎ। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার বহুদিন ধরেই অন্যান্য অপ্রচলিত বিকল্প শক্তির উৎপাদনে জোর দিচ্ছে। তবে আগামী দুই থেকে তিন দশক ভারতের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার অধিকাংশই তাপবিদ্যুৎ থেকে মিটবে বলে অভিমত বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের।

ইমানুয়েল মাকরঁ'র ভারত সফরে ছাব্বিশটি রাফায়েল বিমান চুক্তি

পিআইবি॥ চলতি বছরের মার্চ মাসে ভারতে আসছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ। সূত্রের খবর আরও ২৬ টি রাফায়েল বিমান কেনার ব্যাপারে ভারত-ফ্রান্সের চুক্তি হবে এই সফরে। এর আগে প্রথম দফায় ফ্রান্সের সংস্থা দাসোঁ অ্যাভিয়েশন ভারতকে ৩৬ টি রাফায়েল যুদ্ধবিমান দিয়েছে। গত ৫ জানুয়ারি দিল্লিতে প্রেসিডেন্ট মাকরঁ'র কূটনৈতিক উপদেষ্টা ইমানুয়েল বন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় কৌশলগত অংশীদারিত্ব-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভারত-ফ্রান্স ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ওপর আলোকপাত করেন। সেই সঙ্গে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে ফ্রান্সের সমর্থনকে স্বাগত জানান নরেন্দ্র মোদী।

রাষ্ট্রপতি মাকরঁ'র পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বন্ধুত্বের বার্তা জানিয়েছেন কূটনৈতিক উপদেষ্টা ইমানুয়েল বন। সেইসঙ্গে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে তাঁর কৌশলগত আলোচনার

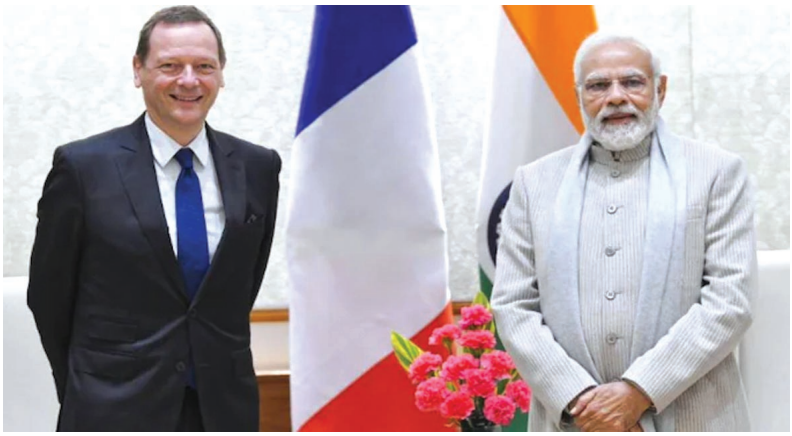

বিষয়ে অবগত করান। এরপর শক্তি, বিকল্প শক্তির প্রযুক্তি, সংস্কৃতি-সহ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নরেন্দ্র মোদী ও ইমানুয়েল বন। সেই প্রসঙ্গে বন ফরাসি প্রেসিডেন্টের ভারত সফরে আসার কথা জানান। কূটনৈতিক সূত্রের খবর, আগামী মার্চেই ভারতে আসছেন ইমানুয়েল মাকরঁ।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বালিতে ফরাসি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষতের সময় তাঁকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে ফরাসি প্রেসিডেন্টের ভারত সফর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। এর আগে ফ্রান্সের থেকে ৩৬ টি অত্যাধুনিক রাফায়েল যুদ্ধবিমান কিনেছে ভারত। যা ভারতে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। এবার দ্বিতীয় দফাতেও ২৬ টি রাফায়েল ভারতে আসবে বলে খবর। শুধু তাই নয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রযুক্তি আদান-প্রদান করার আগ্রহও প্রকাশ করেছে ফ্রান্স।

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ভিশন ২০৪৭

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাদের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি 'ভিশন ২০৪৭' প্রকাশ করল। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার একশো বছর পূর্তিতে বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। গত ৭ জানুয়ারি এই কর্মসূচি প্রকাশ করেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি কল্যাণ চৌবে। তিনি ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য নতুন রূপরেখা সবার সামনে তুলে ধরেছেন, তাতে ভারতীয় ফুটবলকে এশিয়ার অন্যতম সেরা শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০৪৭ সাল পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়েছে।

ওই বছরই ভারতের স্বাধীনতার একশো বছর পূর্ণ হচ্ছে। আগামী ২৪ বছর কীভাবে কাজ এগোবে, তা এই রূপরেখায় থাকলেও কাজের কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে ২০২৬ সাল থেকে, এমনটা আশা করছেন এআইএফএফ-এর সচিব সাজি প্রভাকরণ।

ভিশন ২০৪৭-এর লক্ষ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, দেশের সাড়ে তিনকোটি ছেলে-মেয়েকে ফুটবলের মধ্যে আনা। দশ লক্ষ ফুটবলারকে নথিভুক্ত করা। ফুটবলারদের জন্য বছরে ৫৫ ম্যাচ নিশ্চিত করা। মেয়েদের ফুটবলে উন্নয়নের পাশাপাশি ভারতের বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্যপূরণ এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য। এআইএফএফ-এর সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানান, 'আগামী ২৫ বছরে আমরা ভারতীয় ফুটবলের প্রভূত উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দূরতম এলাকা থেকে প্রতিভা খুঁজে আনার কাজ করবে এআইএফএফ। পাশাপাশি জোর দেওয়া হচ্ছে মেয়েদের ফুটবলকে। ভারতীয় ফুটবলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তার জন্য পরিশ্রম করছেন। জোর দেওয়া হবে ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতার ওপরেও।'

স্বস্তিকা

(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)

২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫

E-mail : swastika 5915@gmail.com

স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে। নিজ নিজ প্রান্তে তারিখ সুনিশ্চিত করে অভিযান করবেন।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

তিলকরঞ্জন বেরা
সম্পাদক

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ২৮।।

প্রথমে রাগ করলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন ম্যানেজার কথা প্রসঙ্গে জানলেন যে মহানামব্রতজী একজন ডাবল এম. এ. এবং সম্পূর্ণ আইন অনুযায়ী টিকিট কেটেই এ পর্যন্ত প্যারিসে এসেছেন ও শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে আমন্ত্রিত, তখন ম্যানেজার সম্মানের সঙ্গে কথা বললেন।

মহানাম সম্প্রদায় বিষয়ে ম্যানেজারের প্রশ্নের উত্তরে মহানামব্রতজী জানালেন, আশ্রমবাসী আছেন প্রায় একশজন সন্ন্যাসী। তাঁরা খোল-করতাল নিয়ে ঈশ্বরের নামগান করেন। নিত্য প্রার্থনা করেন পৃথিবীর কল্যাণের জন্য। যেমন করে বেতারে পৃথিবীর এক প্রান্তের কথা অন্য প্রান্তে যায়, ঠিক সেইভাবেই নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনাও ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়। *(ক্রমশ)*